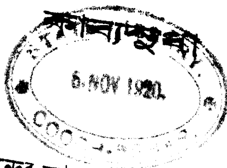
কাব্যসুধা

লেখকের অন্যান্য পুস্তক।

ফোয়ারা (২য় সংস্করণ)	১৲
কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব	॥০
অনুপ্রাস (হরগৌরীর চারিবর্ণে মুদ্রিত চিত্র সমেত)	॥০
ককারের অহঙ্কার	।/০
ব্যাকরণ-বিভীষিকা (২য় সংস্করণ)	।৵০
বাণান-সমস্যা	৶০
সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা	৵০
ছড়া ও গল্প (শিশুপাঠ্য সচিত্র, ৩য় সংস্করণ)	।০
আহ্লাদে আটখানা (শিশুপাঠ্য সচিত্র)	।/০

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাব্যসুধা



(বঙ্কিম-চন্দ্রের কাব্য-গ্রন্থাবলি হইতে সংগৃহীত)

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন
এম এ কর্তৃক প্রণীত।

সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদ আলাপঃ সজ্জনৈঃ সহ॥

১৩২৩

মূল্য এক টাকা।

কলিকাতা

৬৫নং কলেজষ্ট্রীট্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত।

৩৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, স্বর্ণপ্রেসে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে
নারীতে নারীতে মধুর প্রীতিসম্পর্কের
আদর্শ-প্রদর্শনার্থ

বঙ্কিম-চন্দ্রের কাব্য-গ্রন্থাবলি হইতে সংগৃহীত

কাব্যসুধা

বঙ্গমহিলাদিগের পবিত্র হস্তে শ্রদ্ধার সহিত
সমর্পণ করিলাম।

উপহার-পৃষ্ঠা।

বঙ্কিম-চন্দ্রের কাব্য-গ্রন্থাবলি হইতে সংগৃহীত

কাব্যসুধা

....

শ্রী...কে

......................উপহার দিলাম। ইতি

.... }
.... } শ্রী...
১৩২ }

লেখকের আর একখানি সমালোচনা-পুস্তক

কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব।

মূল্য আট আনা।

'কপালকুণ্ডলা'র সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সমালোচনা। ইহাতে নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ, ইউরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্যে অঙ্কিত সমশ্রেণীর নায়িকাগণের সহিত তুলনায় সমালোচনা, কপালকুণ্ডলা নামের বিচার, নায়িকার পরিবেষ্টনী (environment), কাব্যের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতি বহু তথ্যের সমাবেশ আছে।

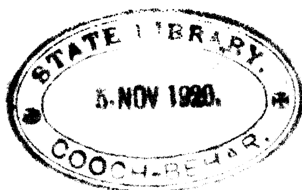
অভিমত।

"সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা রচনার রস সৌন্দর্য্য কৃতিত্ব বিশেষত্ব অতি বিচক্ষণ পাণ্ডিত্যের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার বই অতি অল্পই আছে; ইহা তাহাদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবে।"—**প্রবাসী**

"গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্যবলে ললিতকুমার বঙ্কিম-প্রতিভার ষোলকলা বিস্তার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"—**নব্যভারত**

"শ্রীযুক্ত ললিত বাবু এই পুস্তকে তাঁহার অতুলনীয় সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; যাঁহারা কপালকুণ্ডলা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই এই তত্ত্ব পাঠ করা উচিত।"—**ভারতবর্ষ**

"On the whole the volume appears to us to strike out a completely new path in the department of Criticism in our literature......We can confidently affirm that B. A. Candidates will receive substantial help from this timely publication".—BENGALEE.



ভূমিকা।

এই পুস্তকের অন্তর্গত মূল প্রবন্ধ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ননদ-ভাজ' ও 'শ্বাশুড়ী-বৌ' সাধারণ সভায় পঠিত এবং যথাক্রমে 'ভারতবর্ষে'র কার্ত্তিক ও চৈত্রসংখ্যায় (১৩২০) মুদ্রিত হইয়াছিল। 'বোনে বোনে' প্রবন্ধ উক্ত মাসিক পত্রের ভাদ্র-সংখ্যায় (১৩২৩) 'দুই ভগিনী' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। 'পরিশিষ্টে' প্রদত্ত 'একান্নবর্ত্তী পরিবার' প্রবন্ধ 'শ্বাশুড়ী-বৌ' প্রবন্ধের সমকালে এবং প্রধানতঃ উহারই পরিশিষ্ট-হিসাবে লিখিত হইয়া সাধারণ সভায় পঠিত এবং (অধুনালুপ্ত) 'আর্য্যাবর্ত্তে' (বৈশাখ ১৩২১) মুদ্রিত হইয়াছিল।

একই উদ্দেশ্য লইয়া মূল প্রবন্ধ তিনটি লিখিয়াছিলাম। সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে বলিয়া এক্ষণে সব কয়টি একত্র পুনর্মুদ্রিত ও পুস্তকাকারে প্রচারিত করিতেছি। পুনর্মুদ্রণকালে প্রবন্ধগুলির বহুস্থলে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি। এক প্রবন্ধের কোন কোন কথা অন্য প্রবন্ধে পুনরুক্ত হইয়াছে; প্রত্যেক প্রবন্ধের সম্পূর্ণতা ও স্বতন্ত্রতা-রক্ষার জন্য এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে একই কথার পুনরুক্তি হইলে পাঠকদিগের বিরক্তিবোধ হইতে পারে বলিয়া কোন কোন স্থলে সেরূপ না করিয়া অন্য প্রবন্ধে বরাত চালাইয়াছি।

পূর্ব্ববর্ত্তী সমালোচকগণ এক একখানি পুস্তক বা এক একটি চরিত্র ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলির সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাই প্রচলিত প্রণালী। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। এক একটি গার্হস্থ্য-সম্পর্ক ধরিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে এবং

প্রাসঙ্গিকভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাচীন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং ইংরেজী সাহিত্যে, ঐ শ্রেণীর চিত্র থাকিলে তাহার সহিতও তুলনায় সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রাচীন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সমালোচনা-কালে, সুন্দর আদর্শ-সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার শ্রেষ্ঠতা ও মৌলিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলি যে দিক্ হইতেই দেখা যায়, সেই দিক্ হইতেই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি ও কলাকৌশলের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। সুতরাং এই অভিনব প্রণালী-অবলম্বনে সমালোচনা করায় বোধ হয় কোন দোষ হয় নাই, বরং একটু নূতনভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের লিপি-চাতুর্য্য ও কাব্যমাধুর্য্য-প্রদর্শনের সুযোগ হইয়াছে। দুইটি কারণে এই নূতন পথ অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী নভেলের অনুকরণে তাঁহার আখ্যায়িকাবলিতে কেবল নায়ক-নায়িকার প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, অপরাপর প্রীতিস্নেহের-বর্ণনা আদৌ করেন নাই,—এই সিদ্ধান্ত বঙ্গীয় সমালোচক-মহলে প্রচলিত আছে। উক্ত প্রচলিত মত-খণ্ডনের জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধ-ত্রয় এবং 'সতীন ও সৎমা' ও 'মা' প্রবন্ধাবলি রচনা করিয়াছি। [শেষোক্ত প্রবন্ধাবলি 'ভারতবর্ষে' আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র-কার্ত্তিক-সংখ্যায় (১৩২১) এবং শ্রাবণ-ভাদ্র-সংখ্যায় (১৩২২) মুদ্রিত হইয়াছে।] এই সকল প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র পারিবারিক জীবনে ননদ-ভাজে, শাশুড়ী-বৌএ, বোনে বোনে, সতীনে সতীনে ভালবাসা, মাতার সন্তানস্নেহ, বিমাতার সপত্নী-সন্তানের প্রতি অপক্ষপাতে স্নেহ, প্রভৃতির সুন্দর ও উজ্জ্বল চিত্র একাধিক স্থলে অঙ্কিত করিয়াছেন। এমন কি, কতকগুলি পারিবারিক সম্পর্কের বেলায় আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে সাধারণ বিরোধের চিত্রই অঙ্কিত হইত, বঙ্কিম-দীনবন্ধু ও অন্যান্য ইংরেজীনবীশ লেখকগণই প্রথম

সদ্ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিয়া নূতন, সুন্দর, পবিত্র আদর্শের প্রচার করিয়াছেন ; পরন্তু এ সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণ করেন নাই, এগুলি তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ মৌলিকতার পরিচায়ক ও প্রকৃত হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত, ইহাও দেখাইয়াছি।

পুনশ্চ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের কাহিনীকে প্রাধান্য দিয়া ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে ও অনুসরণে আমাদের সাহিত্য বিকৃত করিয়াছেন,—এই মতের খণ্ডনার্থ দেখাইয়াছি যে আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালা ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যেও ঠিক এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে ; লঘুসাহিত্যের ইহাই নিয়ম, ইহা একমাত্র বিলাতী সাহিত্যের বিশিষ্টতা নহে, সুতরাং ইহাকে বিলাতী সাহিত্যের অনুকরণ বলিলে একদেশদর্শিতা হয়।

প্রবন্ধগুলির প্রথম-প্রচারকালে কেহ কেহ টিটকারী দিয়াছিলেন যে,—বর্ত্তমান লেখক অণুবীক্ষণের সাহায্যে ছোট জিনিশকে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন, যাহা সহজে চোখে পড়ে না তাহা বড় করিয়া চোখের সামনে ধরিয়াছেন, যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে নিতান্ত সামান্য আকারে ছিল সেইটাকে ফলাও করিয়া দিয়াছেন। যদি তর্কের খাতিরে এই কথাই যথার্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও তদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, আধুনিক সমালোচনা একটা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ; সুতরাং যাহা প্রচ্ছন্ন তাহা ফুটাইয়া তোলা, যাহা গুপ্ত তাহা প্রকাশ করা, যাহা সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাহা উপেক্ষিত অলক্ষ্য তাহা যে উপেক্ষাযোগ্য নহে পরন্তু লক্ষণীয় ইহা বুঝানই ত—বৈজ্ঞানিক সমালোচকের কার্য্য।

মৌমাছির সঞ্চিত মধুর স্বাদ আমরা অবশ্য জানি, আর তাহার হুলের খোঁচার কথাটাও আমরা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক শুধু এইটুকু দেখিয়া বা দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তিনি অণুবীক্ষণ-

সাহায্যে মৌমাছির ক্ষুদ্র শরীরের বিচিত্র নির্ম্মাণকৌশল, তাহার পক্ষযুগলের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা, দেখাইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করান, শুধু মধু বা শুধু হুল লইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। সেইরূপ, সাধারণ পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের মধুচক্রে সঞ্চিত প্রেমমধুপান করিয়া ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সমালোচনা-প্রণালীর হুল লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। কিন্তু প্রেমমধু ছাড়াও যে তাঁহার কাব্যে বহু সুন্দর, মধুর, উজ্জ্বল বস্তু লুক্কায়িত আছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে কি ?

লোকে 'বিষবৃক্ষ' পড়ে—নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর প্রেমকাহিনীর জন্য, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পড়ে—গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীর প্রেমকাহিনীর জন্য, এমন কি 'দেবী চৌধুরাণী' পড়ে—ব্রজেশ্বর-প্রফুল্লর প্রেমকাহিনীর জন্য, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এই সকল প্রেমকাহিনীতে যথেষ্ট মধুর ও করুণ রস আছে, তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু কমলমণি-সূর্য্যমুখীর অর্থাৎ ননদ-ভাজের সখিত্ব, ভ্রমর ও যামিনী দুই ভগিনীর সখিত্ব, প্রফুল্ল ও সাগর দুই সতীনের সখিত্ব,—এগুলিও কি রমণীয় ও দর্শনীয় নহে ? সাধারণতঃ লোকে প্রেমবর্ণনা-পাঠে এত বিভোর থাকে যে, সহজে অন্য সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য প্রকার প্রীতির চিত্রও উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, ক্ষীণ রেখায় অঙ্কিত করেন নাই, কিন্তু প্রেমকাহিনীর তীব্র আলোকে লোকের চোখ ঝলসাইয়া যায়, তাই অন্যান্য প্রকার প্রীতির চিত্র উজ্জ্বল হইলেও চোখ এড়াইয়া যায়। দোষ বঙ্কিমচন্দ্রের নহে, দোষ পাঠকের চোখের—অর্থাৎ সাধারণ মানবপ্রকৃতির। কিন্তু বিজ্ঞ সমালোচকগণও যে সাধারণ মানবের ন্যায় এ সৌন্দর্য্য দেখিতে পান না, এ সকল উজ্জ্বল চিত্র যে তাঁহাদিগের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেও পড়ে না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

যাহা হউক, প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা প্রবন্ধগুলিতে বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি। কোন কোন স্থলে তর্ক-বাহুল্যে প্রবন্ধের রসভঙ্গ হইয়াছে কিনা জানি না। উভয় মতের কোন্‌টি সমীচীন, সুধীবর্গ তাহার বিচার করিবেন। কেবল 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র প্রসিদ্ধ শ্লোকটি তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥

এই পুস্তক-প্রকাশে, বিশেষতঃ পরিশিষ্টে প্রদত্ত প্রবন্ধ-প্রকাশে, আমার আর একটি অবান্তর উদ্দেশ্য আছে। পারিবারিক জীবনেই বাঙ্গালীর যা' কিছু সুখ। পরিবারের মধ্যে নারীতে নারীতে সদ্ভাব না থাকিলে পুরুষকেও সংসারে বহু অশান্তি ভোগ করিতে হয়। যাহাতে বঙ্কিম-দীনবন্ধু-প্রমুখ লেখকগণের অঙ্কিত ননদ-ভাজ, শ্বাশুড়ী-বৌ, প্রভৃতির পরস্পরের প্রতি স্নেহপ্রীতির সুন্দর চিত্রগুলি নারীহৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হয় এবং তাহার প্রভাবে ঐ আদর্শে পারিবারিক-জীবন গঠন করিতে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি ও উৎসাহ হয়, এই উদ্দেশ্যে চিত্রগুলি তাঁহাদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম। পরিশিষ্টে বলিয়াছি, আজকাল অন্তঃপুরে লঘু-সাহিত্যের অত্যন্ত প্রসার। ইহা নিবারণ করা বোধ হয় অসাধ্য, অন্ততঃ দুঃসাধ্য। সুতরাং লঘুসাহিত্যের মারফতই যাহাতে তাঁহাদিগের সুশিক্ষা হয়, তদ্‌বিষয়ে সচেষ্ট হওয়াই সুবুদ্ধির কার্য্য। নাটক-নভেলও যে ঠিক ভাবে পাঠ করিলে তাহা হইতে সৎশিক্ষালাভ হয়, তাঁহাদিগকে ইহা দেখাইয়া সেইভাবে নাটক-নভেল পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই

জন্য, বহু নাটক, আখ্যায়িকা ও ছোট-গল্পের নাম ও পরিচয় পরিশিষ্টের শেষ অংশে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

এই দীর্ঘ ভূমিকায় বিবৃত উভয় উদ্দেশ্য কিয়দংশে সিদ্ধ হইলেও সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব। কিমধিকমিতি

কলিকাতা
কার্ত্তিক, ১৩২৩

শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা।

সূচী।

ননদ-ভাজ।

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে।)

গোড়ার কথা।

বাঙ্গালীর সংসারে নববধূ বালিকাবয়সেই স্বামিগৃহে পদার্পণ করে। সেই দিন হইতে এক রকম সারাজীবন যখন তাহাকে পরের (?) ঘরে কাটাইতে হয়, তখন তাহার বাল্যসখী সহোদরা ভগিনীর সঙ্গে দেখা-শুনার সম্ভাবনা কম; বরং স্বামীর ভগিনীর সঙ্গে দেখাশুনা ঘরকরনার সম্ভাবনা বেশী। এ অবস্থায় ননদ-ভাজে সখিত্ববন্ধন ঘটিলে সোণার সংসার হয়।

কিন্তু বাঙ্গালীর সংসারে ননদ-ভাজের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ, এইরূপ লোক-প্রসিদ্ধি। সংস্কৃত সাহিত্যে বা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কোথাও ননদ-ভাজের একত্র বসবাসের বা সদ্ভাব-সম্প্রীতির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। (১) পক্ষান্তরে, শাশুড়ী-ননদের হাতে গৃহস্থ-বধূর

---

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে পঠিত। (১৯এ জুলাই, ১৯১৩।) স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, পি এচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

(১) সংস্কৃত সাহিত্যে এক সুভদ্রা-সত্যভামার বেলায় ননদ-ভাজের মধুর সম্পর্ক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাও কেবল সুভদ্রার কুমারী-কালে। সুভদ্রার বিবাহিত জীবনে সত্যভামার সঙ্গে তাঁহার একত্রবাস কখন ঘটিত কিনা এবং কিরূপ সম্প্রীতি ছিল, তাহা জানা যায় না। 'মালতীমাধবে' নন্দন-ভগিনী মদয়ন্তিকা আশৈশব ধূলা-খেলার সঙ্গিনী মালতী ভ্রাতৃবধূ হইবে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে (৪র্থ অঙ্ক)। কিন্তু তাহার সে সাধ পূরে নাই।

লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথাই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে, প্রবাদ-বাক্যে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে, ব্রত-নিয়মে, ও বাস্তব জীবনে, (২) শুনিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বিধবা (বা সধবা) শ্বাশুড়ী বাঙ্গালীর ঘরে গৃহিণীপনা করেন ও বধূকে অল্প-বিস্তর নির্য্যাতন করেন। অথবা (স্বামীর বয়োধিকা) বিধবা (বা কুলীনের ঘরে সধবা) নিঃসন্তানা ননন্দা গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া বিরাজ করেন, তাঁহার বাক্য-যন্ত্রণায় গৃহস্থ-বধূ জড়সড়। আমাদের খাঁটি বাঙ্গালী সমাজে ইহাই সাধারণ নিয়ম।

সাহিত্যক্ষেত্রে দেখি—— ('Nectar-mouthed mother-in-law ') সুধামুখী শ্বাশুড়ী-ননদের দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যে জটিলা-কুটিলাতে প্রকট। তবে জটিলা-কুটিলার পক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, তাঁহারা কৃষ্ণলীলার গুহ্য তত্ত্ব বুঝেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের বিবেচনায় শ্রীরাধার অপরাধ গুরুতর।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে দেবীকে ব্যাধ-রমণী জিজ্ঞাসা করিতেছে,—

'শ্বাশুড়ী-ননন্দ, কিবা কৈল মন্দ, সত্য কথা কহ মোরে।'

আবার কালকেতু ফুল্লরাকে বলিতেছে,—

'শ্বাশুড়ী-ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব কর‍্যা চক্ষু কৈলি রাতা॥'

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' দেবীকে জয়া পিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন,—

'জননীর আশে, যাবে পিতৃবাসে,
ভাজে দিবে সদা তাড়া।'

(২) কেহ কেহ বলেন এখন দিনকাল ফিরিয়াছে। এখন বধূই রণচণ্ডী। কিন্তু আজকালকার দিনেও ত সংবাদপত্রের স্তম্ভে শ্বাশুড়ী-ননদের হস্তে বধূর নির্য্যাতনের মোকর্দ্দমার বিবরণ মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

ননদের উপর ভাজের কত টান ইহা হইতে তাহা বিলক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দরে' কবি আরও ঘোরালো করিয়া বলিয়াছেন,—'সতিনী বাঘিনী, শ্বাশুড়ী রাগিণী, ননদী নাগিনী, বিষের ভরা।' উক্ত কাব্যে 'পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি' শুনি বটে, কিন্তু এই যুবতী ভাজদিগের সঙ্গে বিদ্যার সদ্ভাব-সম্প্রীতির, সখিত্ববন্ধনের, এমন কি, একত্রবাসের কথা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই।

ইংরেজের আমলের শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরগুপ্ত পৌষ-পার্ব্বণের সুখ-সমৃদ্ধি-বর্ণনায় বলিয়াছেন,—

'বধূর রন্ধনে যদি যায় তাহা এঁকে।
শ্বাশুড়ী-ননদ কত কথা কয় বেঁকে॥
বধূর মধুর খনি মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চোখ ছলছল॥
প্রাণে আর নাহি সয় ননদের জ্বালা।
বিষমাখা বাক্য-বাণে কাণ হ'ল কালা॥'

আবার মুখরা মেঝবৌ শ্বাশুড়ী-ননদীর নামে স্বামি-সকাশে চুকুলি কাটিতেছে,—গুপ্ত-কবি সে চিত্রও ফুটাইয়াছেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের ('নাটুকে রামনারায়ণে'র) 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে একজন নারী সেই মামুলি সুরে খেদ করিতেছেন,—

'শ্বাশুড়ী বাঘিনী প্রায়, ননদী নাগিনী তায়
যদি কোন ছল পায়, তবে রক্ষা থাকে না।'

আবার তৎপ্রণীত 'নবনাটকে'ও ইহারই প্রতিধ্বনি শুনা যায়। 'বিধুর যে শাশুড়ী ছিল, মাগী যেন রায়বাঘিনী, ননদটিও কালনাগিনীর মত, বড় ফেলা যান না, সব কথাগুলি শাশুড়ীর কাণে অমনি তুলে দিত,

রাত্তিরে স্বামির কাছে কি কথাটি বলেছে আড়িপেতে শুনে তাও আবার সাতখানি করে্য লাগাতো।'

কুলীনের ঘরে আমরণ পিতৃগৃহবাসিনী কুমারী বা নামমাত্র বিধাহিতা ননদের ভ্রাতৃজায়ার হস্তে লাঞ্ছনার কথাও গুপ্তকবির চেলা ৺ দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনী' কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন :—'ভ্রাতৃজায়া ভাল মুখে কথা নাহি কয়, অধোমুখে অনাথিনী দিবানিশি রয়, কখন পাচিকা বালা, কভু দাসী হয়, তবু কি মুখের অন্ন সুখে উপজয় ?' কুলীন-সমাজের সংস্কার-প্রয়াসী ৺ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্বরচিত ও সংগৃহীত দুই একটি গানেও তাঁহাদিগের এই দুর্দ্দশার কথা বর্ণিত আছে। যথা—'ভ্রাতৃজায়া-গণের দাস্যবৃত্তি কোরে পোড়া উদর পোষি আজীবন ভোরে', 'দাসী হয়ে রব কত ভ্রাতৃবধূর মুখ চেয়ে।' সমাজের নানারূপ অনাচার-নিবারণে সর্ব্বদা বদ্ধপরিকর পরদুঃখকাতর প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎ-প্রণীত বহুবিবাহ-নিবারক প্রথম পুস্তকে লিখিয়াছেন—'প্রখরা ও মুখরা ভ্রাতৃভার্য্যারা তাঁহাদের উপর, যারপরনাই, অত্যাচার করেন। ভ্রাতৃ-ভার্য্যারা, সর্ব্বদাই, তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত।' উক্ত পুস্তকে চট্টরাজের স্ত্রী ও কন্যার প্রসঙ্গে আবার ইহার ঠিক উল্টা অর্থাৎ ভাজের উপর ননদের বিরাগের কথা আছে ('তাঁহার ভগিনীরা দুর্দ্দান্ত দস্যু')।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী সমাজে শ্বাশুড়ী-ননদের সঙ্গে বধূর কি মধুর সম্পর্ক, ননদ-ভাজে কি দারুণ ভালবাসা, তাহা এই সব উদাহরণ হইতেই বেশ বুঝা গেল।

ব্রত-নিয়মে বঙ্গবালা যে সব সাধ-আহ্লাদ করিয়া ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করেন, তাহার ভিতর 'শঙ্কর হেন স্বামী পাঁব, কার্ত্তিক-গণেশ পুত্র পাব, লক্ষ্মী-সরস্বতী কন্যা পাব, ভীম-অর্জ্জুন ভাই পাব' অথবা 'রামের মত পতি পাব, লক্ষ্মণের মত দেওর পাব, লব-কুশ পুত্র

পাব, সীতার মত সতী হব' এমন কি 'দশরথ শ্বশুর পাব, কৌশল্যা শাশুড়ী পাব'—এ সব সাধ আছে, কিন্তু ননদ সম্বন্ধে কোন সাধ নাই। সে যে একেবারেই বন্ধ্যাপুত্রের মত অসম্ভব! বাঙ্গালীর বিবাহ-প্রথায়, বালিকা ননন্দাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, ননদ-পেটারি, দুয়ার-ধরুনি, ঘট-নামানি প্রভৃতি অনুষ্ঠান আছে—পাছে বড় হইয়া "ননদিনী" "কাল-নাগিনী" হইয়া দাঁড়ায়।

'দাদার গলায় তুলসীদানা, বৌর কাঁকালে চন্দ্রকোণা।
হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি বৌ এনে দাও খেলা করি॥'

ছেলেবেলার এ সাধ 'মেয়েলি ছড়া'য় আছে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে বৌ আসিলে সে সাধে বাদ পড়ে।

আবার এ হেন ননদের উপর ভাজের কত প্রাণের টান তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত—'ভাল কথা মনে হ'ল আঁচাতে আঁচাতে। ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে' ইত্যাদি ছড়ায় রহিয়াছে। (৩) বৈয়াকরণের মতে ন-নন্দ হইতে যদি ননন্দৃর ব্যুৎপত্তি হয়, (৪) তবে ত এ নামের সঙ্গে আনন্দ-আবদারের, সাধ-আহ্লাদের, সম্প্রীতি-সদ্ভাবের, কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। (৫)

(৩) কথিত আছে, ননদ-ভাজে এক সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলেন; সেখানে ননদকে কুমীরে টানিয়া লইয়া গেলে ভাজ তাহার উদ্ধারের চেষ্টা ত করেনই নাই, পরন্তু ঘরে ফিরিয়া সে কথা বলিতেও বিস্মৃত হইয়াছিলেন; শেষে পেট ভরিয়া আহার করিয়া আঁচাইবার সময় কথাটা মনে পড়াতে উক্ত মজাদারী ছড়ার আকারে সেই শুভবার্ত্তা শাশুড়ীকে জ্ঞাপন করিলেন।

(৪) সংস্কৃতসাহিত্যে রসমঞ্জরীর ৩০শ শ্লোকের ব্যঙ্গ্যার্থকৌমুদী-নাম্নী ব্যাখ্যায় আছে —ন নন্দতি ভ্রাতৃজায়ামিতি ননান্দা ভ্রাতৃভগিনী। ননান্দাপদং নিয়তদ্বেষবিশেষবত্ত্বং ব্যনক্তি। শ্লোকটি অশ্লীল। তজ্জন্য উদ্ধৃত করিলাম না।

(৫) প্রবন্ধপাঠের পর একজন হুমুরী সমালোচক পরোক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-

বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ ইংরেজীনবীশ লেখকগণ আমাদের সাহিত্যে বিকৃত বিলাতী আদর্শ আমদানী করিয়াছেন এবং আমাদের প্রাচীন সামাজিক পারিবারিক প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন বলিয়া একশ্রেণীর সমালোচকগণ সময়ে অসময়ে তাঁহাদের নিন্দাবাদ করেন। এ কথা কত দূর বিচারসহ, তাহা সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ইংরেজীনবীশ লেখকগণ তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব কল্পনা-বলে, বাঙ্গালী জাতির কল্যাণ-কামনায়, নূতন আদর্শে সমাজ-গঠন-চেষ্টায়, বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে ননদ-ভাজের স্নেহবন্ধন ঘটাইয়াছেন, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন, মরুভূমিতে উৎস উৎসারিত করিয়াছেন—ইহা কি তাঁহাদিগের কম কৃতিত্ব? এই নূতন আদর্শের জন্য, প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষের, প্রত্যেক বিবাহার্থী পুরুষের, প্রত্যেক কুলবধূর, প্রত্যেক কুলকন্যার, এই ইংরেজীনবীশ লেখক-সম্প্রদায়ের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত সাহিত্যে বা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহারা এ আদর্শ পান নাই। সীতা, (৬) সাবিত্রী, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, চিন্তা ইত্যাদির ননদ ছিল না। খুল্লনা, ফুল্লরা, লহনা, রত্নাবতী প্রভৃতিরও ননদ ছিল না। কথায় কথায় যে ইংরেজী সাহিত্যের

ছিলেন—'পাণ কিনলাম চূণ কিনলাম নন্দভেজে খেলাম'—এই ছড়ায় ত ননদ-ভাজের গলায় গলায় ভাবের কথা রহিয়াছে। কিন্তু, 'একটি পাণ হারাল দাদাকে ব'লে দিলাম'—এই শেষটুকুতে যে সর্ব্বনাশের সূচনা দেখিতেছি! এই ছুতায় দাদার কাছে চুকুলি কাটায় ব্যাপার কত দূর গড়াইয়াছিল কে জানে? এই পাণ-হরণ হয়ত মণিহরণের চেয়েও ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল!

(৬) করুণ-রসের কবি ভবভূতি করুণা-পরবশ হইয়া সীতাদেবীর ননন্দা শান্তার অবতারণা করিয়াছেন—কিন্তু, তাহাও গৌণভাবে।

কথা তুলিয়া এই সম্প্রদায়ের লেখকদিগের মৌলিকতার দাবি খর্ব্ব করা হয়, সে ইংরেজী সাহিত্য হইতে এই অভিনব আদর্শ আমদানী নহে—কেন না ইংরেজ-সমাজে বিবাহের পর ভাই স্বতন্ত্র, বোন স্বতন্ত্র, (৭) পিতৃগৃহে কালেভদ্রে তাহাদের দেখা হয়। বাস্তবিক পক্ষে, যে সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই সে সমাজে এ আদর্শের সন্ধান করাই বাতুলতা। সাধারণতঃ বিবাহিত জীবনের চিত্রও বিলাতী নভেলে প্রদর্শিত হয় না, বিবাহের মধুরমিলনে গল্পের পরিসমাপ্তি হয়। অতএব সাধারণতঃ (৮) সে সমাজে ননদভাজের একত্রবাস কবিকল্পনায়ও আসিতে পারে না।

---

(৭) চিরকুমার মেকলে ভারতবর্ষে অবস্থানকালে কিছুদিন ভগিনী-ভগিনীপতির সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন। এই ভগিনী মেকলের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ইনি মেকলের সঙ্গে প্রবাসে আসিতে সম্মত হইলে, তবে মেকলে ভারতবর্ষে চাকরী স্বীকার করেন। তখন অবশ্য ভগিনী অনূঢ়া। ইংরেজ লেখকদিগের জীবন-চরিত হইতে ননদ-ভাজের একত্রবাসের দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। ল্যাম্বের চিরকুমারী পিসিমা ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত একত্র বাস করিতেন, ননদ-ভাজের প্রথম কিছুদিন অসদ্ভাব ও পরে সদ্ভাব ঘটে। অপর দৃষ্টান্তটি বড়ই উজ্জ্বল, বড়ই মধুর। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তাঁহার পত্নী ও তাঁহার চিরকুমারী ভ্রাতৃগতজীবিতা ভগিনী ডরোথি, তিন জনে একত্র বাস করিতেন। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই cousin-সম্পর্কিতা ননদ-ভাজের সখিত্ববন্ধন ছিল। ইঁহাদের একাত্মতা এত অধিক ছিল যে honeymoon-কালেও দেশভ্রমণের সময় ডরোথি নবদম্পতীর সঙ্গভ্রষ্ট হয়েন নাই।

(৮) বিখ্যাত 'ঈষ্ট লিন' আখ্যায়িকায় ননদ-ভাজের একত্রবাসের চিত্র সদ্ভাবের চিত্র নহে। পক্ষান্তরে টেনিসনের 'ডোরা'য় ডোরা নিজ প্রেমাস্পদের নিকট প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও উক্ত প্রেমাস্পদের (জ্যেঠতুত ভাইএর) পত্নী মেরীর প্রতি স্নেহময়ী; বিধবা মেরীর সঙ্গে একত্রবাসকালে উভয়ের যথেষ্ট হৃদ্যতা দেখা যায়। বলা বাহুল্য, ননদ-ভাজের একত্রবাসের এরূপ দুই একটী চিত্র ইংরেজী সাহিত্যে তথা ইংরেজসমাজে সাধারণ বিধি নহে—বিশেষ বিধি, exception rather than the rule.

তবে ভগিনীর 'সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গ-নয়নী'র প্রতি ভ্রাতার প্রেমসঞ্চার হইতেছে এবং সে ক্ষেত্রে ভগ্নী দূতী (১) ও সখী সাজিয়া বিবাহের ঘটকালী করিতেছেন, অথবা ভ্রাতার 'সহপাঠী কেলিচর, অভেদাত্মা হরিহর' ভগিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী এবং সে অবস্থায় ভ্রাতা 'দুটি প্রাণে'র মিলনের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতেছেন—এরূপ চিত্র ইংরেজী সাহিত্যে বিরল নহে। কিন্তু তাহার সহিত আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনেক প্রভেদ। অতএব এই সুন্দর আদর্শ-প্রচারে ইংরেজীনবীশ লেখকদিগের মৌলিকত্ব ষোল আনা, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, ইংরেজীনবীশ লেখক-সম্প্রদায় এক্ষেত্রে কিরূপ কল্পনা-সৌন্দর্য্যের, কিরূপ কৃতিত্ব-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, মনস্বী লেখক ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহার সুচিন্তিত 'পারিবারিক প্রবন্ধে' বিচার করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও ননদ-ভাজের কথা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই, শ্বাশুড়ী-বৌএর কথাই বেশী করিয়া বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার গম্ভীর রচনায় এতদুভয়ের বিরোধ-বিদ্বেষের প্রসঙ্গই তুলিয়াছেন। অতএব এক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের একটি সম্পর্কের আবহমান-কাল-প্রচলিত বিরোধ-বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে সম্প্রীতি-সদ্ভাবের চিত্র-পরিকল্পনা ও আদর্শ-প্রচার এই ইংরেজীনবীশ সম্প্রদায়ের রচিত কাব্য-নাটকের মারফতই প্রথম হইয়াছে। অন্ততঃ একটি স্থলে এই নবীন সম্প্রদায় সমাজ ভাঙ্গেন নাই,—গড়িয়াছেন, পারিবারিক সম্পর্কের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ করেন নাই,—প্রসারিত করিয়াছেন, পারিবারিক জীবনের সুখশান্তির হ্রাস করেন নাই,—বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

(১) ভগ্নীদূতী ভগ্নদূতের স্ত্রীলিঙ্গ নহে! ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকাকারের টিপ্পনী।

নাট্য-সাহিত্যেই এই নূতন আদর্শ-প্রচারের চেষ্টা প্রথম দৃষ্ট হয়। মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা', ৺ দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী' ও কমলে কামিনী' এবং ৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটক এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। (১০) ক্রমে উক্ত নাটকগুলির আলোচনা করিতেছি।

মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় ননদ প্রসন্নময়ী ও ভাজ হরকামিনীর সখিত্বের একটি চিত্র আছে (২য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক) কিন্তু তাহা বড় সংক্ষিপ্ত, তাহা হইতে উভয়ের একাত্মতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' কতকটা মাইকেলের প্রহসনের সদৃশ। কিন্তু ইহাতে ননদ সৌদামিনী ও ভাজ কুমুদিনীর সখিত্বের চিত্র (২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক) উজ্জ্বল ও মনোহর। 'লীলাবতী'তে ভাজ ক্ষীরোদবাসিনী ননদ লীলাবতী অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুইখানি নাটকের ন্যায় ইহাতে ননদ-ভাজে ইয়ারকি নাই; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা বর্ত্তমান। ক্ষীরোদবাসিনী নিজের মর্ম্মান্তিক দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াও লীলাবতীকে বলিতেছেন, 'তোকে আমি মেয়ের মত ভালবাসি'; আর লীলাবতীও বলিতেছেন, 'বউ, আমার মা নাই, তুমি ছেলে কাল হইতে আমায় মায়ের মত প্রতিপালন করেচ, তোমাকে কাতর দেখ্‌লে আমার হাত পা পেটের ভিতর যায়।' (৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক।) 'কমলে কামিনী'তে শিখণ্ডিবাহন-পত্নী রণকল্যাণী বলিতেছেন, 'সুশীলাকে আমি বুকে ক'রে রাখ্‌বো', ও সুশীলাকে 'আরাধ্যা সঙ্গিনী' করিতে আগ্রহ করিতেছেন (৪র্থ অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক)। তবে সে

(১০) 'জামাইবারিকে' কামিনী বড় ভাজকে মায়ের মত মান্য করেন, বলিতেছেন বটে, কিন্তু সদ্ভাবের কোন নিদর্শন নাই, বরং 'ভেজের গঞ্জনা'র কথা আছে। তবে সে কামিনীর নিজের দোষে।

শিখণ্ডিবাহনের প্রকৃত ভগিনী নহে—ধর্ম্মভগিনী। সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হইলেও, ৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটকে ননদ সুশীলা ও ভাজ সরলার সখিত্বের চিত্র দৃশ্যের পর দৃশ্যে (১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক) অতি উজ্জ্বল, অতি মনোহর বর্ণে বিভাসিত। উভয়ের সম্প্রীতি ও সমবেদনার পরিচয় সুপরিস্ফুট।

চারিটি (চারু) চিত্র।

নাট্যসাহিত্য ছাড়িয়া এক্ষণে দেখা যাউক আখ্যায়িকা-সাহিত্যে এই সম্পর্কের সুন্দর আদর্শ কোথায় কোথায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রই অগ্রণী। তবে তাঁহার প্রথম আখ্যায়িকা 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ননদ-ভাজের নামগন্ধও নাই। থাকিবার কথাও নহে। কেন না ইহাতে নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য-জীবনের ইতিহাস বিবৃত নহে। ইংরেজী নভেলের ন্যায় ইহাতেও পূর্ব্বরাগ, মিলন, মিলনান্তে বিচ্ছেদ (ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ, The course of true love never did run smooth); আবার বিচ্ছেদান্তে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পুনর্ম্মেলনে পরিসমাপ্তি। (অনেকে হয়ত বলিয়া বসিবেন, এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী নভেলের অনুকরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, এরূপ ব্যাপার আমাদের সংস্কৃত কাব্য-নাটকেও বিরল নহে। দৃষ্টান্তরূপে 'মালতীমাধবে'র উল্লেখ করিতে পারি।) পূর্ব্বোক্ত কারণে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রাধারাণী', এমন কি 'মৃণালিনী', 'ইন্দিরা' প্রভৃতিতে ননদ-ভাজের সমাগম নাই। যে সকল আখ্যায়িকায় দাম্পত্য-জীবন-যাপনের অবসর ঘটিয়াছে অর্থাৎ আরম্ভেই বিবাহক্রিয়া-নির্ব্বাহান্তে পতিপত্নী একত্র বাস করিতেছেন, সেইগুলিতেই ননদ-ভাজের অবতারণা হইতে পারে।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর আখ্যায়িকাগুলি অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার এই শ্রেণীর প্রথম আখ্যায়িকা 'কপালকুণ্ডলা'-তেই এই নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম প্রথম যেন তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন। তাই লিখিয়াছেন—'নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা, তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী, সধবা হইয়াও বিধবা, কেননা তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।' (২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ঘরে বিধবা মাতা বা বিধবা সন্তানহীনা জ্যেষ্ঠা ভগিনী গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে নবকুমারের মাতাকে ও নবকুমারের জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে (শ্যামার নজীরে তাঁহার নাম ক্ষ্যামা কি বামা এই রকম একটা কিছু ছিল) background এ রাখিয়াছেন, সধবা কনিষ্ঠা ভগিনীকে পাঠকের সহিত পরিচিত করিয়াছেন। স্বামীর কনিষ্ঠা ভগিনী বধূর সমবয়স্কা হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং ননদ-ভাজে সখিত্ববন্ধনেরও সম্ভাবনা, এই বুঝিয়াই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র কনিষ্ঠা ভগিনীকেই আসরে নামাইয়াছেন। শুধু 'কপালকুণ্ডলা'য় কেন, 'বিষবৃক্ষে', 'চন্দ্রশেখরে', 'আনন্দমঠে', যেখানে যেখানে তিনি ননদ-ভাজের সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন, সেখানে সেখানেই দেখি ননন্দা সধবা ও স্বামীর বয়ঃকনিষ্ঠা।

আর একটি কারণেও তিনি 'কপালকুণ্ডলা'য় (শ্বাশুড়ী ও) বড় ননদকে backgroundএ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলাকে তিনি লোকালয়ে আনিয়াও তাঁহার সহিত নরনারীর সম্পর্ক যথাসম্ভব অল্প করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। (একথা 'কপাল-কুণ্ডলাতত্ত্বে' বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়াছি।)

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের ননদ শৈলবতীর কয়েক স্থানে উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা হইতে ধরিতে পারা যায় না, তিনি সধবা কি বিধবা। গোবিন্দলাল জমিদারী-পরিদর্শনের অছিলায় প্রবাসে গেলে ভ্রমরের মেজাজ খারাপ হওয়াতে সে 'ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল'; শ্বাশুড়ী ও স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় শ্বাশুড়ী তাহাকে বলিয়া গেলেন, 'তোমার বড় ননদ রহিল'; বহুকাল স্বামীর সংবাদ না পাইয়া সে 'ননন্দাকে বলিয়া শ্বাশুড়ীকে পত্র লেখাইল'; পরে অসহ্য হইলে ভ্রমর 'কাঁদিতে কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন'। উক্ত পুস্তকের স্থানে স্থানে ননদ-ভাজের এইরূপ প্রসঙ্গ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য নহে। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্র ননদের সৌহার্দ্দ-সহানুভূতির অত্যুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে আর তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দুই ভগিনীর সৌহার্দ্দ-সহানুভূতির উজ্জ্বল চিত্র (ভ্রমর ও যামিনী) অঙ্কিত করিয়া নবভাবের সঞ্চার করিয়াছেন।

'বিষবৃক্ষে' সূর্য্যমুখী-কুন্দনন্দিনীতে, ধরিতে গেলে, প্রথমে ননদ-ভাজ সম্পর্ক (তারাচরণকে সূর্য্যমুখী 'ভাই' বলিতেন); সেই সম্পর্কে সূর্য্যমুখী কুন্দকে যথেষ্ট আদরযত্নও করিয়াছিলেন, কুন্দও তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। পরে গ্রহবৈগুণ্যে উভয়ের সম্পর্ক অন্য প্রকার দাঁড়াইল।

পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা'য় মেয়েমজলিসের বর্ণনায় যমুনাদিদি ও তাঁহার 'ভাইজে'র চিত্র আছে; সেখানে 'চঞ্চলা নামে যমুনাদিদির ভাইজ' মাঝে মাঝে ননদকে ঠোকর মারিতেছেন দেখা যায়। ইহা কুৎসিত বাস্তব চিত্র।

যাহা হউক, এ সব অপ্রধান দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিলে, 'কপালকুণ্ডলা'য় শ্যামাসুন্দরী-মৃন্ময়ী, 'বিষবৃক্ষে' কমলমণি-সূর্য্যমুখী, 'চন্দ্রশেখরে' সুন্দরী-শৈবলিনী ও 'আনন্দমঠে' নিমাই-শান্তি (১০) ননদ-ভাজের এই চারিটি চিত্র আমাদের চোখে পড়ে। এই চারিটি চিত্রের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

এইখানে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক আখ্যায়িকাকারদিগের পুস্তকেও এই সম্পর্কের সুন্দর চিত্র দেখা যায়। কিন্তু ইহার অনেকগুলি স্পষ্টই বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ও তাঁহার অনুকরণে লিখিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ' এ মেজ বউ প্রমদার শ্বশুরালয়ে ছোট ননদ বামার সঙ্গে ও পিত্রালয়ে ভাজের সঙ্গে সদ্ভাব সুন্দর-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিধবা বড় ননদ শ্যামা ভাজের প্রতি স্নেহশালিনী নহেন। ৺ রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ' ও 'সমাজে' এবং শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্ন-মুকুলে' ও 'লজ্জাবতী' নামক ছোট-গল্পে ননদ-ভাজের প্রীতিসম্পর্কের সুন্দর চিত্র আছে।

অতএব বুঝা গেল যে, এ ক্ষেত্রে ইংরেজীনবীশ লেখক-সম্প্রদায় কাব্যে-নাটকে এই পারিবারিক সম্পর্কের সুন্দর আদর্শ প্রচার করিয়া সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইব, পাঠকবর্গকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যসুধার কয়েক বিন্দুর স্বাদ লইতে আহ্বান করিব।

---

(১০) যে সকল পাঠিকা ননদ বা ভাজ লইয়া ঘর করেন, তাঁহাদিগের এই চারিখানি আখ্যায়িকা পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রবন্ধের আরম্ভে বলিয়াছি যে, বাঙ্গালী বধূর নিজের ভগিনী অপেক্ষা স্বামীর ভগিনীর সঙ্গে একত্র বসবাস ও ঘরকরনার সম্ভাবনা বেশী। ঝোঁকের মাথায়, বোধ হয়, কথাটার উপর একটু বেশী জোর দিয়া ফেলিয়াছি। কেন না, আমাদের সংসারে সধবা নারীর বারমাস পিত্রালয়ে বাস করা সাধারণ নিয়ম নহে। মহাকবি কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন,—

সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং
জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।

দীনবন্ধু অস্থার্থ করিয়াছেন,—(সুরধুনী কাব্য, ৮ম সর্গ)

স্বামী সত্বে নারী যদি নিবসতি করে
নবীন যৌবনকালে জনকের ঘরে।
সাবিত্রী-সমান সতী হলেও কল্যাণী
কলঙ্ক-আমোদী লোক করে কাণাকাণি।

রামেশ্বরের শিবায়নে আছে,

স্বামিঘরে কন্যা থাকে, ধন্য তার বাপ মাকে
অভাগার ঘরে থাকে ঝী।

এমন কি, বিধবা নারীও পিতা বা ভ্রাতার গলগ্রহ না হইয়া শ্বশুরের বা শ্বশুর অবর্ত্তমানে, ভাশুরের বা দেবরের পরিবারস্থা হইয়া থাকেন, ইহাই হিন্দু-পরিবারের স্বাভাবিক ব্যবস্থা। সুতরাং ননদের ভাজের সহিত সর্ব্বদা একত্রবাস সাধারণ নিয়ম নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আখ্যায়িকাবলিতে কাব্যরসের অনুরোধে এ ব্যবস্থার রদবদল করেন নাই। এক 'কপালকুণ্ডলা'তেই ননদ-ভাজের একত্র ঘরসংসার করার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি তজ্জন্য কৈফিয়তও দিয়াছেন। 'শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা, কেননা তিনি কুলীন-পত্নী।' ['কপালকুণ্ডলা'—২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।] 'চন্দ্রশেখরে' সুন্দরী

শৈবলিনীর সহিত একপরিবারস্থা নহেন, তিনি 'চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসি-কন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। তাঁহার পিতা নিতান্ত অসঙ্গতিশালী নহেন। সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন। তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখনও কখনও শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকিতেন।' ['চন্দ্রশেখর'—২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' শৈলবতীর যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে অনুমান হয়, তিনিও পিতৃগৃহে থাকিতেন। তিনি সধবা কি বিধবা তাহাও ঠিক বুঝা যায় না। ধনিকন্যা বলিয়াই সম্ভবতঃ তিনি 'চন্দ্রশেখরে' বর্ণিত সুন্দরীর ন্যায় পিত্রালয়ে থাকিতেন। এ তিনটি স্থলেই দেখা গেল, বিশেষ বিশেষ কারণবশতঃই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এরূপ ব্যতিক্রমও হিন্দুসমাজে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 'বিষবৃক্ষে' কমলমণি কলিকাতায় স্বামীর কাছে থাকিতেন, কেবল প্রয়োজন হইলেই ভ্রাতৃগৃহে আসিতেন, এই পর্য্যন্ত। ইহাই হইল ঠিক প্রচলিত প্রথা। 'আনন্দমঠে' নিমাই শান্তির প্রতিবেশিনী, তাঁহার সহিত একপরিবারস্থা নহেন। কি প্রবল কারণে জীবানন্দ পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া ভগিনীর শ্বশুরালয়ের গ্রামে শান্তিকে অধিষ্ঠিতা করিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থকার 'আনন্দমঠে'র পঞ্চম সংস্করণে সংযোজিত একটি পরিচ্ছেদে [২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ] আমূল বিবৃত করিয়াছেন।

ননদ-ভাজের এই চারিটি চিত্র তুলনায় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এগুলির মধ্যে নানারূপ সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। যথা— 'কপালকুণ্ডলা'য় শ্যামার স্বামিভাগ্য তত সুপ্রসন্ন নহে, সে স্বামিপ্রেমে একপ্রকার বঞ্চিত, স্বামিপ্রেম-লাভের জন্য ব্যাকুল; পক্ষান্তরে জংলা মেয়ে কপালকুণ্ডলা স্বামী চেনে না, প্রেম জানে না, সংসারের সারসুখ বোঝে না, স্বামী অথচ তাহার রূপে পাগল, তাহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত,

তাহার প্রেমলাভের জন্য লালায়িত। ননদ-ভাজের ঠিক বিপরীত অবস্থা। 'আনন্দমঠে'র নিমাইএর শ্যামার সঙ্গে অনেক অংশে মিল থাকিলেও সে স্বামি-সৌভাগ্যবতী, এ বিষয়ে শ্যামার সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ প্রভেদ; শান্তি প্রায় কপালকুণ্ডলার মতই জংলা মেয়ে ছিল, কিন্তু সে কপালকুণ্ডলার মত সংসারসুখে বীতরাগ নহে, স্বামি-প্রেমলাভে আগ্রহ-শূন্য নহে, পক্ষান্তরে তাহার স্বামীই (ব্রতরক্ষার জন্য) তাহাকে দূরে রাখিতে চাহে—কপালকুণ্ডলার ঠিক উল্টা। (তবে স্বামীর পত্নী-প্রেমের অভাব নাই।) 'চন্দ্রশেখরে' সুন্দরীর স্বামি-ভাগ্য বোধ হয় শ্যামা ও নিমাইএর মাঝামাঝি; চন্দ্রশেখর নবকুমারের মত পত্নী-গতপ্রাণ, শৈবলিনী অথচ (কপালকুণ্ডলার মত) তাঁহাকে চাহে না; কপালকুণ্ডলার সঙ্গে এইটুকু সাদৃশ্য থাকিলেও যখন উভয়ের বিতৃষ্ণার কারণ সন্ধান করা যায়, তখন দেখা যায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। 'বিষবৃক্ষে' কমলমণি নিমাইএর মত স্বামিসৌভাগ্যবতী; পক্ষান্তরে নগেন্দ্রনাথ (ক্ষণিক মোহবশতঃ) সূর্য্যমুখীর প্রতি বীতস্নেহ, আর সূর্য্যমুখী তাঁহার হারান ভালবাসা ফিরিয়া পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত। একেবারে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর ঠিক উল্টা। এই সমস্ত বিচিত্র অবস্থায় ননন্দার সখিত্ব কিরূপ মনোরম হইয়াছে, আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

আখ্যায়িকাগুলি পর পর যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল সেই ক্রম অবলম্বন না করিয়া, ননদ-ভাজের সখিত্ব-সম্পর্ক কিরূপে স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়াছে, সেই ক্রম অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিব। 'কপালকুণ্ডলা'য় কেবল দুইটি পরিচ্ছেদে (২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ও ৪র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ) শ্যামার দর্শন-লাভ ঘটে। প্রথমটিতে দেখি, শ্যামা বনবাসিনীকে গৃহবাসিনী করিতে, যোগিনীকে গৃহিণী করিতে,

সচেষ্ট। দ্বিতীয়টিতে দেখি, সে কার্য্য কতকটা সিদ্ধ হইয়াছে। আর একটি কার্য্যসিদ্ধির জন্য শ্যামার এবার আবির্ভাব। শ্যামার স্বামি-সৌভাগ্য ঘটাইবার জন্য, ননন্দার প্রতি স্নেহময়ী মৃন্ময়ী ঔষধ-আহরণার্থ নিবিড় বনে গেল; এই ঔষধ-আহরণই তাহার কাল হইল। এস্থলে আখ্যায়িকাখানিকে নিদারুণ বিয়োগান্ত উপাখ্যানে পরিণত করিতে শ্যামার প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা শ্যামাসুন্দরীর স্বার্থপরতার দোষ দিব না—দোষ অদৃষ্টের; অথবা আরও প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিব যে, কপালকুণ্ডলার চরিত্রের ভিতর এমন একটি জিনিশ বীজরূপে ছিল যাহার অপ্রতিবিধেয় পরিণতি তাহার নিদারুণ জীবনাবসান। শ্যামা 'নিমিত্তমাত্র।' (একথা 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্বে' বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়াছি।) পাছে পাঠক এই কথা ধরিতে না পারেন সেই জন্য পূর্ব্ব সংস্করণে বঙ্কিম-চন্দ্র চতুর্থখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে এই অদৃষ্টতত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন। এক্ষণে সেই পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত।

যাহা হউক, ইহার পর আর শ্যামাসুন্দরীর দেখা পাই না। প্লটের যে বিবর্ত্তনের জন্য শ্যামার প্রয়োজন ছিল, তাহা সংসাধিত হইয়াছে।

এইরূপ 'আনন্দমঠে'ও কেবল দুইটি পরিচ্ছেদে (১ম খণ্ড ১৫শ পরি-চ্ছেদ ও ২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ) নিমাইএর দর্শনলাভ ঘটে। প্রথমটিতে সে জীবানন্দের সঙ্গে শান্তির মিলন ঘটাইয়া দিল। এইখানেই তাহার কর্ত্তব্য ফুরাইল। দ্বিতীয়টিতে সেই মিলন-ব্যাপারের কিঞ্চিৎ আলোচনা।

তাহার পর হইতে শান্তির জীবনে এমন এক পরিবর্ত্তন আসিল যে, তখন নিমাইএর সখিত্ব তাহার কাছে অতি তুচ্ছ পদার্থ। সেই জন্য আর আমরা নিমাইকে দেখিতে পাই না।

'কপালকুণ্ডলা' ও 'আনন্দমঠ'—উভয়ত্রই দেখিলাম ননদ-ভাজের সম্পর্ক ক্ষণিক, তড়িচ্চমকের মত আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে;

উভয়ত্রই দাম্পত্য-চিত্র এত অল্প স্থান অধিকার করিয়াছে যে, তাহার পারিপার্শ্বিক-ভাবে ননদ-ভাজ-সম্পর্ক-বিকাশেরও অধিক অবকাশ নাই। পক্ষান্তরে 'চন্দ্রশেখর' ও 'বিষবৃক্ষে' দাম্পত্য-চিত্র অনেক অধিক স্থান যুড়িয়া আছে, সুতরাং তাহার পারিপার্শ্বিক ননদ-ভাজের চিত্রও অনেক স্থান যুড়িয়া আছে। তাই উভয় পুস্তকেরই নানাস্থলে নানাভাবে আমরা সুন্দরী ও কমলমণির দেখা পাই।

এক্ষণে এক এক করিয়া চারিটি চিত্রের বিস্তারিত আলোচনা করিব।

(১) শ্যামা ও কপালকুণ্ডলা।

নবকুমার হিজলির জঙ্গল হইতে জংলা মেয়ে ধরিয়া আনিয়াছেন, 'বনবিহগিনী'কে সংসার-পিঞ্জরে পূরিয়াছেন। পাখীকে পোষ মানাইবার জন্য, বনবাসিনীকে গৃহবাসিনী করিবার জন্য, একজন স্নেহশীলা সঙ্গিনীর প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য শ্যামাসুন্দরীর আবির্ভাব। নামটি হয়ত আজকালকার কোমলপ্রাণ পাঠকপাঠিকার পছন্দ হইবে না, কিন্তু যাহার জন্য এই আয়োজন তাহার কাণে নামটি নিশ্চয়ই মধুর বাজিয়াছিল—কেন না কপালকুণ্ডলা আবাল্য যে দেবতার আরাধনা করিয়াছে, যে দেবতা তাহার ধ্যান-জ্ঞান, এ যে সেই দেবতারই নাম। বহুবিবাহের ফলে কুলীনদের ঘরে তখনকার দিনে অনেক সময়েই সধবা ভগিনী ভ্রাতৃ-পরিবারে থাকিতেন (এখনও বিরল নহে)—শ্যামা সেই শ্রেণীর। শ্যামা নিজে স্বামি-সুখে একপ্রকার বঞ্চিত, কিন্তু তাই বলিয়া সে ভ্রাতৃবধূকে রমণী-জীবনের সেই সারসুখ ভোগ করাইতে এক দণ্ডের তরেও নিবৃত্ত নহে। শ্যামার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই দেখি, সে স্বামি-প্রেমের একমাত্র ভোগদখলকারিণী না হইয়াও সদা প্রফুল্ল, ভ্রাতৃবধূর মনোরঞ্জনে, তাহাকে সাজাইতে, তাহাকে স্বামীতে অনুরক্তা করিতে, কতই না কৌশল করিতেছে। এই ত স্নেহময়ী ননন্দার প্রকৃত কায।

প্রথমেই যখন এই যুবতীযুগলকে একত্র দেখিতে পাই, তখন দেখি 'শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃজায়াকে কখনও "বউ", কখনও আদর করিয়া "বোন", কখনও "মৃণো" সম্বোধন করিতেছিলেন।' বুঝা গেল, তিনি ভ্রাতৃজায়াকে কেমন ভালবাসেন। আবার দেখি, শ্যামাসুন্দরী ছড়া কাটিয়া পতি-পত্নীর ভালবাসার ব্যাখ্যানা করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবধূর চুল বাঁধিয়া দিবার যোগাড় করিতেছেন। এই চুল বাঁধিয়া দেওয়া বাঙ্গালী নারী-জীবনে একটি কবিত্বরসময় ব্যাপার; নারীহৃদয়ের কত সোহাগ-যত্ন, কত আদর-ভালবাসা, এই সামান্য কার্য্যের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র আবার 'বিষবৃক্ষে' ও 'আনন্দমঠে' এই দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। (১২) বাঙ্গালীজীবনের এতটুকু সূক্ষ্ম অংশও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। চুল বাঁধিতে বাঁধিতে শ্যামাসুন্দরী কত আদর করিতে-ছেন, যোগিনীকে গৃহিণী করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। আমরা পরিচ্ছেদটির (২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বাস্তবিকই এই মধুর দৃশ্য সমস্ত আখ্যায়িকাটিকে মধুময় করিয়াছে—বিশেষতঃ শেষের নিদারুণ শোক-কাহিনীর সহিত (Contrast) বিরোধিতায়।

'শ্যামাসুন্দরী একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা—

"বলে—পদ্মরাণী, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥

---

(১২) শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর ছিন্নমুকুলের ২৯শ পরিচ্ছেদে এই দৃশ্যের অনু-করণে একটি দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে। সেই দৃশ্যে নীরজা ভাজ ও কনক ননদ (অনূঢ়া যুবতী)। তবে নীরজা জংলা মেয়ে হইলেও প্রণয়ের মর্ম্ম বুঝেন, তাঁহাকে পোষ মানাইতে কনককে বেগ পাইতে হয় নাই। রমেশচন্দ্রের 'সমাজ' এই মধুর দৃশ্যে আরম্ভ। রমেশচন্দ্রের পুস্তক অবশ্য 'কপালকুণ্ডলা'র অনেক পরবর্ত্তী।

আবার—বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নাম্‌লে ঢল, সাগরেতে যায়॥
ছি ছি—সরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।.
বিয়ের কনে রাখ্‌তে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
মরি—এ কি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পর-পরশে, সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ॥”

“তুই কিলো একা তপস্বিনী থাকিবি ?”

মৃন্ময়ী উত্তর করিল, “কেন, কি তপস্যা করিতেছি ?”

শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃন্ময়ীর কেশতরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল, “তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না ?”

মৃন্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, “ভাল, আমার সাধটি পূরাও। একবার .আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে ?”

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণ-সন্তানেরর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না ?

শ্যা। কেন ? দেখিবি ? যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে, জান ?

মৃন্ময়ী কহিলেন, “না !”

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোণা হয়।

মৃ। তাতে কি ?

শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি ?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস্। দেখিবি,

বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কাণে তোর দিব যোড়া দুল ॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভোরে পান গুয়া,
রাঙ্গা মুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোণার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কিনা লাগে ॥'

তাহার পর, অনেক দিন পরে যখন আমরা আবার উভয়ের একত্র দর্শন পাই, তখন দেখিতে পাই শ্যামার ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলিয়াছে,. স্পর্শমণির সংস্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে। নবকুমারের হৃদয়ভরা ভালবাসা এই পরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইলেও, শ্যামার স্নেহ, শ্যামার যত্ন, শ্যামার প্ররোচনা, যে ইহার সমবায়িকারণ তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পরিচ্ছেদে (৪র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ) ননদ-ভাজের কথোপকথনে বুঝিলাম, মৃন্ময়ীও এখন শ্যামাকে ভালবাসিয়াছে, শ্যামার ভালবাসার প্রতিদান দিতে শিখিয়াছে; 'প্রতিদানে ভালবাসা ভালবাসা পায়'। ননদের মঙ্গলের জন্য, তাহাকে স্বামি-সৌভাগ্যবতী করিবার জন্য, সে লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর বারণ না মানিয়া, একাকিনী অন্ধকার রাত্রিতে নিবিড় অরণ্যে ঔষধ সংগ্রহ করিতে যাইতেছে। ননদ-ভাজের এই মাথামাথি গলাগলি, এই দরদে দরদ, কি মধুর, কি কোমল !

শ্যামা-চরিত্রের চিত্রণে আর একটি বিশিষ্টতা আছে। এই প্রথম উদ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্র ননদ-ভাজের একত্র এক সংসারে বাসের সুমধুর কল্পনাকে মূর্ত্তি দিয়াছেন। এমনটি তাঁহার অন্য কোন আখ্যায়িকায় নাই।

(২) নিমাই ও শান্তি।

'আনন্দমঠ' 'কপালকুণ্ডলা'র বহুবৎসর পরে রচিত হইলেও 'আনন্দমঠে'র নিমাই 'কপালকুণ্ডলা'র শ্যামাসুন্দরীর উন্নত সংস্করণ (improved edition); মনে হয় শ্যামা ঠাকুরাণীই জন্মান্তরে নিমাইরূপে দেখা দিয়াছেন। শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রে যে সামান্য একটু স্বার্থপরতার ভাঁজ ছিল (স্বার্থপরতা বলিলে বড় শক্ত কথা বলা হয়—O call it by a gentler name) সেটুকু এজন্মে ক্ষালিত হইয়াছে। যেন সেই পাপের অন্তর্দ্ধানে তাহার দুঃখেরও তিরোভাব হইয়াছে!—সে এজন্মে স্বামি-সৌভাগ্যবতী। ভৈরবীপুরে বাস হইলেও তাহার নাম এবার আর শ্যামাসুন্দরী নহে, প্রেমের ঠাকুর নিমাইএর নামে তাহার নাম (১৩)। শ্যামাসুন্দরী-কপালকুণ্ডলায় অপূর্ব্ব যোড় বাঁধিয়াছে, নিমাই-শান্তিতেও অপূর্ব্ব যোড় বাঁধিয়াছে। নিমাই নিজে স্বামি-সুখ পাইয়াছে, ভ্রাতৃবধূ স্বামি-সুখে বঞ্চিত তজ্জন্য সে বড় মনঃক্ষুণ্ণ। সে দাদাকে বড় ভালবাসে, বৌদিদিকেও বড় ভালবাসে। তাই বৌদিদির সঙ্গে দাদার মিলন ঘটাইতে সে বড় ব্যস্ত, বড় ব্যগ্র। ১মখণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদের শেষ অংশটি কি মধুর, কি সুন্দর! এখানেও সেই চুলবাঁধা, সেই বৌ সাজান, সেই রঙ্গকৌতুক, আর সেই ননদ-ভাজে গলায় গলায় ভাব। নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

'হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীর মধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত-বসন-পরিধানা

(১৩) শান্তি বুঝি ভৈরবীপুরের ভৈরবী?—ছাপাখানার ভূত।

রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। নিমাই গিয়া বলিল, "বৌ, শীগ্‌গির, শীগ্‌গির।" বৌ বলিল, "শীগ্‌গির কিলো? ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে না কি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?"

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে?

সে স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তারপর তাহাকে এক কীল মারিয়া বলিল, "তোর সেই ঢাকাই কোথা আছে, বল্।" সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কিলো তুই কি খেপেছিস্ নাকি?"

নিমাই ভুম্ করিয়া তাহার পিঠে এক কীল মারিল, বলিল, "শাড়ী বের কর।" * * * *

সে হাসিতে হাসিতে (কেহ সে হাসি দেখিল না) সেই ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া দিল। বলিল "কিলো নিমি, কি হইবে?" নিমাই বলিল, "তুই পর্‌বি।" সে বলিল, "আমি পরিলে কি হইবে?" তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, "দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।" সে বলিল, "আমায় যেতে বলেছেন ত ঢাকাইশাড়ী কেন? চল্ না এমনি যাই।" নিমাই তার গালে এক চড় মারিল,—সে নিমাইএর কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটীরের বাহির করিল। বলিল, "চল্, এই ন্যাকড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।" কিছুতেই কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।'

স্বামি-স্ত্রীর ক্ষণিক মিলনের পর আর একবার (২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ) আমরা নিমাইএর দেখা পাই। তখন নিমাই নিজের চেষ্টা সফল হইয়াছে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শান্তির সঙ্গে কত কথা বলিল, দু' একটা মামুলী ধরণের রসিকতাও চলিল—কিন্তু শান্তির হৃদয়ে তখন যে ঝড় বহিতেছিল, তাহার বেগ সদানন্দময়ী গৃহস্থকন্যা নিমাই সহিতে পারিল না। এখানেও একটু উদ্ধৃত করিলাম।

'জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইএর দাওয়ার উপর বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকট আসিয়া বসিল। শান্তির চোকে আর জল নাই, শান্তি চোক মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাসিতেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল, "তবু ত দেখা হলো।"

শান্তি কিছু উত্তর করিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল, শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না, শান্তি মনের কথা বলিতে ভালবাসে না, তাহা নিমাই জানিত, সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল। বলিল, "দেখ দেখি, বউ, কেমন মেয়েটি !"

শান্তি বলিল, "মেয়ে কোথা পেলি—তোর মেয়ে হলো কবে লো ?"

নিমা। মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও—এ যে দাদার মেয়ে।

নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্য এ কথাটা বলে নাই। দাদার মেয়ে অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটি পাইয়াছি। শান্তি তাহা বুঝিল না ; মনে করিল, নিমাই বুঝি সূচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল, "আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"……তার পর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইএর সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিল। পরে নিমাইএর স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটীরে গেল।'

দুইটি চিত্রেই দেখা গেল, গ্রন্থকার ননদের উপর ভাজের ভালবাসা অপেক্ষা, ভাজের উপর ননদের ভালবাসার উপর বেশী জোর (stress) দিয়াছেন্। ইহা ঠিকই হইয়াছে। পরের মেয়েকে আপন করিতে হইলে ননদের তরফ হইতে বেশী বেশী ভালবাসা আসা চাই। মনস্বী ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধে' শ্বাশুড়ী-বৌ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, —"একটি পাখীকে তার কোটর থেকে আনা হইবে, তাকে পোষ মানাইতে হইবে, সে সুখ না পেলে পোষ মানিবে কেন? যাহাতে সে আপনার কোটর ভুলে, আপনার বাপমাকে ভুলে, বাপের বাড়ী যাইতে না চায়, তাকে এরূপ করিয়া তুলিতে হইবে।" কথাগুলি ননদ-ভাজ প্রসঙ্গেও খাটে।

(৩) সুন্দরী ও শৈবলিনী।

'সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী, শৈবলিনীর সখী।' [১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।] সম্পর্ক দূর; কিন্তু সে পর হইয়াও আপন, আপন ননদও এত করে না। সুন্দরী ও তাহার ভগিনী রূপসী অন্বর্থনাম্নী ছিল কিনা জানি না, তবে ইংরেজীতে একটা প্রবচন আছে—Handsome is that handsome does—সে কথাটা সুন্দরীর বেলায় খুব খাটে। শৈবলিনীর জন্য তাহার স্বার্থত্যাগ, কষ্ট-স্বীকার, প্রাণপাত পরিশ্রম, শৈবলিনীর প্রতি তাহার অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচায়ক। তবে দোষের মধ্যে ঘটনাগুলি নিতান্তই romantic adventure, সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ঘরে যেরূপ ঘটে সেরূপ নহে।

এই আখ্যায়িকায়, পূর্ব্ব দুইখানির মত, চুল বাঁধিয়া দেওয়ার উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু যখন দুই সখীতে ভীমা পুষ্করিণীতে সাঁঝের বেলা গা ধুইতে জল আনিতে গিয়াছিল, তখন তাহার পূর্ব্বে যে চুলবাঁধা-পর্ব্ব

সমাধা হইয়াছিল, ইহা বেশ অনুমান করা চলে। ভীমা পুষ্করিণীতে উভয়ের কথাবার্ত্তায় (১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ) বুঝা যায়, তাহাদের সখিত্ববন্ধন কত নিবিড়। (সেই হালকা জলে দাঁড়াইয়া হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে দুই সখীতে যে হালকা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না।) তাহার পর ভীমা পুষ্করিণীতে শৈবলিনী যখন ভীমা প্রকৃতির পরিচয় দিল, তখন লরেন্স ফষ্টারকে দেখিয়া সুন্দরী শৈবলিনীকে ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু এ ভীরুতা বাঙ্গালীর ঘরের বৌঝীরই উপযুক্ত। আর তাহাতে যদি কিছু দোষই হইয়া থাকে, তবে শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্য সে যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্ব অপরাধের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। ডাকাইতির রাত্রে (১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ) শৈবলিনীর দশা জানিয়া সকলের শেষে 'সুন্দরী বসিয়া বসিয়া, প্রভাতে গৃহে গেল, গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।' ইহাতে অন্যান্য প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাহার কতটা প্রভেদ, তাহা বেশ বুঝিতে পারি।

তাহার পর সে শুধু কাঁদিয়াই বাঙ্গালীর মেয়ের মত নিরস্ত হয় নাই। 'নাপিতানী' সাজিয়া (১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ) শৈবলিনীর উদ্ধারচেষ্টা যেমন তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দেয়, তেমনই শৈবলিনীর প্রতি তাহার কতটা প্রাণের টান তাহাও বেশ জানাইয়া দেয়। শৈবলিনী যখন সুন্দরী ঠাকুরঝীর চোখের জল ও নির্ব্বন্ধাতিশয় অগ্রাহ্য করিয়া আত্মরক্ষার জন্য বজরা হইতে পলায়ন করিতে অস্বীকৃতা হইল, তখন সুন্দরী তাহাকে গালি দিল, তাহার মৃত্যুকামনা করিল। কিন্তু এই মর্ম্মান্তিক বাক্যের মধ্যে কতখানি ভালবাসা, কতখানি শুভকামনা নিহিত রহিয়াছে! ইংরেজ কবি প্রকৃতই বলিয়াছেন,—I could not love thee, dear, so much, loved I not honour more ; আর এক-

দিন কমলমণিকে এমনই করিয়া সূর্য্যমুখীকে গালি দিয়া চিঠি লিখিতে দেখিব। তবে সূর্য্যমুখীর অপরাধ, স্বামীর উপর অবিশ্বাস; শৈবলিনীর অপরাধ তদপেক্ষা গুরুতর।

'সুন্দরী বড় রাগ করিয়াই শৈবলিনীর বজরা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। সমস্ত পথ স্বামীর নিকট শৈবলিনীকে গালি দিতে দিতে আসিয়াছিল।......ঘরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল।' (২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ)। তখনও তাহার প্রাণের টান সমান আছে। সে ভগিনীর বাড়ী গিয়া ভগিনীপতি প্রতাপকে নানারূপ বিষদিগ্ধ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া শৈবলিনীর সন্ধানে পাঠাইল। তাহার পরে আবার রূপসীর কাছে বসিয়া বসিয়া 'আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া শৈবলিনীকে গালি দিল' (২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ)। স্নেহময় নারীহৃদয়ের কি অদ্ভুত রহস্য!

অনেকদিন পরে সে যখন শৈবলিনীর অলীক মৃত্যুসংবাদ পাইল, তখন সে 'নিতান্ত দুঃখিতা হইল কিন্তু বলিল, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী এখন সুখী হইল। তাহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তা আর কোন্ মুখে না বলিব?"' (৪র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ)।

সুন্দরীর এই ভালবাসা একতরফা নহে। শৈবলিনীও তাহাকে ভালবাসে। দারুণ মনোবেদনার মধ্যেও তাহার সুন্দরীর কথা মনে পড়ে (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)। উন্মাদিনী স্বপ্নেও সুন্দরীকে দেখে (৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।) তবে গ্রন্থকার এদিক্‌টা তেমন ফুটান নাই। তাহার কারণ 'নিমাই ও শান্তি' প্রসঙ্গের শেষ অনুচ্ছেদে বলিয়াছি।

শেষ খণ্ডে (ষষ্ঠ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ) চন্দ্রশেখর উন্মাদিনী শৈবলিনীকে লইয়া বেদগ্রামে ফিরিলে 'অনেকে দেখিতে আসিতেছিল, সুন্দরী সর্ব্বাগ্রে আসিল।' এখানেও সেই পূর্ব্বের স্নেহ-আগ্রহ। হিন্দুর ঘরের মেয়ের শুচিবায়ু প্রবল, সুন্দরী 'শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তফাৎ

রহিল, কাপড়ে কাপড়ে না ঠেকে।' কিন্তু তথাপি তাহার পূর্ব্বস্নেহ অবিকৃত, সে একদণ্ডের তরেও প্রাণের সখীকে অবহেলা করে নাই। তাহার পর যখন সকল কথা শুনিল, 'সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চকচকে হইল, তার পর পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জলবিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর একদিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকাসহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজি সুন্দরীর ন্যায়, শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে। সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শৈবলিনীর কাছে বসিল, ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে ধীরে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিল না।...... সুন্দরীকে মনে ছিল কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল না।' ইহার পরেও (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে) আমরা দেখি সুন্দরী কত যত্নে শৈবলিনীর শুশ্রূষা করিতেছে। যাহা হউক, এই খানেই আমরা স্নেহময়ী অশ্রুময়ী সুন্দরীর নিকট বিদায়গ্রহণ করি।

(৪) কমলমণি ও সূর্য্যমুখী।

অনেকদিন আগে অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, (১৪) কমলমণি আমার favourite, আমি চিরদিনই কমলমণির গুণপক্ষপাতী। কমল সত্যই সোণার কমল, নারীরত্ন। স্বামিপ্রীতি, পুত্রবাৎসল্য, মাতৃভাব, ভ্রাতৃস্নেহ, ভাজের প্রতি ভালবাসা, সখিত্ব, কমল-হৃদয়ের সব পাঁপড়িগুলিই ফুটিয়াছে। তাই সে প্রস্ফুটিত শতদল কমল (full-blown Rose)। কমলের কথা একটু বেশী করিয়াই বলিব।

(১৪) ফোয়ারা—পত্নীতত্ত্ব।

পূর্ব্ব তিনটি চিত্রে দেখিয়াছি, ননদের ভালবাসার উপরই গ্রন্থকার বেশী জোর দিয়াছেন, কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' ভাজের প্রতি ননদের ভালবাসা ও ননদের প্রতি ভাজের ভালবাসা দুই দিক্‌ই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা কমলমণির প্রথম পরিচয় পাই। 'নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি।...কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।' প্রথম পরিচয়েই বুঝিলাম, কমল স্বামি-সৌভাগ্য-শালিনী। দাদার কুড়ান মেয়েকে লইয়াই তিনি নিমাইএর মত যেরূপ আদর-যত্ন করিতেছেন, তাহাতে অনুমান করিতে পারা যায়, কাছে পাইলে দাদার ঘরের লক্ষ্মীর তিনি কতদূর আদর-যত্ন করেন। এই স্নেহ-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু দুষ্টামি দেখা যায়, সেটুকু বড় মিষ্ট। যেন কমলে কণ্টক, যেন গোলাপের কাঁটা—ইংরেজ কবির কথায়—A rosebud set with little wilful thorns.

ননদ-ভাজের কিরূপ সম্প্রীতি, এ পরিচ্ছেদে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাহার উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার দুইটি স্থল হাস্যোজ্জ্বল। সূর্য্যমুখী কমলসম্বন্ধে একটু মামুলি-ধরণের রসিকতা করিয়াছেন। (আনন্দমঠে নিমাই-শান্তির বেলায়ও ইহা দেখিয়াছি। ইন্দিরাও ফুলশয্যার রাত্রে এইরূপ রসিকতা করিয়াছিল। 'ইন্দিরা'র ২৮শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) 'কিন্তু আজকাল দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই পূরা অধিকার।' 'কমল যদি আমায় বেদখল করে, আমি বড় দুঃখিত হইব না',—এ অংশটুকু (সুরুচির খাতিরে) হালের সংস্করণে পরিত্যক্ত। 'কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও।' 'কমল যদি ছাড়িয়া দেয়'—এ রসিকতা-টুকু উপভোগ করিতে হইলে ইহাতে একটু শ্লেষ বা দ্ব্যর্থ (দোয়োখা ভাব)

আছে, সেটুকু ছাড়িলে চলিবে না। (১৫) এ সব রসিকতা আধুনিক 'মার্জ্জিতরুচি' পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগিবে না, কুৎসিত বিবেচিত হইবে। (১৬) তবে ভবিষ্যতের করুণ-কাহিনী ও গভীর মনোবেদনার সঙ্গে (Contrast) বিরোধিতায় এই ইয়ারকিটুকু মধুর।

তাহার পর একাদশ পরিচ্ছেদে সূর্য্যমুখী ও কমলমণির মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার চলিল, তাহাতেই ননদ-ভাজের প্রগাঢ় প্রণয়ের পূর্ণ পরিচয় পাই। 'আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না।...তুমি আমার প্রাণের ভগিনী, তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভালবাসে না।' ইহাতে বুঝিলাম সূর্য্যমুখী কমলকে কত ভালবাসেন। পতিপ্রাণা নারী, নারীর চরম কষ্ট—স্বামীর পরকীয়াপ্রীতি ও স্বামি-দেবতার চরিত্র-ভ্রংশ দেখিয়া অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন, ও একটু শান্তিলাভের আশায় স্নেহের ননদকে সেই যন্ত্রণার কথা জানাইতেছেন। সূর্য্যমুখীর মত গম্ভীরা নায়িকা মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা প্রাণের সখী ননন্দাকে জানাইতেছেন, তাহাতেই বুঝি উভয়ের প্রীতিবন্ধন কত নিবিড়। তিনি ত স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'তোমার ভাইএর কথা তোমাভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।...কি করি ভাই, তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই—কিন্তু

(১৫) কম্‌লি নেহি ছোড়েগা—এই হিন্দী অনুবাদে আরও একটু ঘোরাল হয়!

(১৬) 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'সধবার একাদশী', 'প্রণয়-পরীক্ষা' প্রভৃতিতে এই ধরণের যে ইয়ারকি আছে তাহা সমাজে প্রচলিত থাকিলেও শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সেগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি অনেক মার্জ্জিত। 'ছিন্নমুকুলে'ও (২৯শ পরিচ্ছেদ) ভাজ নীরজা ননদ কনকের সঙ্গে এরূপ রসিকতা করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্রী কনকের মুখ দিয়া এই 'পচা, পুরাণ, জঘন্য ঠাট্টা'র উপর কষাঘাত করিয়াছেন।

তোমার মুখ চেয়ে আজ ক্ষান্ত হইলাম।···তুমি কি আমাদিগকে দেখিতে আসিবে না? এই সময় একবার আসিও, তোমাকে পাইলে অনেক ক্লেশ নিবারণ হইবে।'

ইহার উত্তরে কমল যাহা লিখিলেন—'দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার'—তাহা সাধারণভাবে পড়িলে মনে হয়, বড় কর্কশ, বড় কঠোর, নিতান্ত হৃদয়হীন অস্থানপ্রযুক্ত রসিকতা। কিন্তু সুন্দরীও একদিন শৈবলিনীকে এমনই নির্ম্মম উত্তর দিয়াছিল। এই কর্কশ, কঠোর উত্তরের ভিতর কি কোমলতা, এই নির্ম্মম বিদ্রূপের ভিতর কি গভীর সমবেদনা ও অকৃত্রিম কল্যাণ-কামনা!

আবার দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শেষভাগে সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্রে হৃদয়ের আকুলতা, যন্ত্রণার তীব্রতা, ও কমলমণির সহিত সখিত্ববন্ধনের নিবিড়তার পরিচয় পাই। 'একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ্ কেহ নাই। একবার এস!' বুঝিলাম, কমল সূর্য্যমুখীর হৃদয়ের কতখানি যুড়িয়া আছেন। চিঠি পড়িয়া স্বামিময়-জীবিতা কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, 'সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিটুকু খোওয়া গিয়াছে—নহিলে মাগী এমন পত্র লিখিবে কেন?' কমলের বাক্যগুলি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।' কমলমণি স্বামি-সৌভাগ্যশালিনী, 'চারুশীলা পতিরতা মধুরতাময়।' তাঁহার বিশ্বাস, যে নারী স্বামীকে বিশ্বাস করে না তাহার মরণ মঙ্গল।

কমলমণি মুখে একথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার 'আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না।' কমলমণি রমণীরত্ন। পত্নীগতপ্রাণ শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়া করুণাময়ী কমলমণি সূর্য্যমুখীর দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিবার জন্য গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। এমন আকুল আহ্বানে

তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—'বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে, সেই প্রাণের টানে টেনে আনে, প্রাণের বেদন জানে না কে?'

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে আমরা কমলমণির করুণাময়ী, কৌতুক-ময়ী, আনন্দময়ী, আলোকময়ী, স্নেহময়ী মূর্ত্তির পরিচয় পাই। 'গোবিন্দ-পুরে দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসিমুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়ীতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেক দিন সূর্য্যমুখী কেশ-রচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন "দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব?" সূর্য্যমুখী তাহার গাল টিপিয়া দিলেন। "না! না!" বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া দুইটা ফুল দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন,—"দেখেছ মাগী বুড়া বয়সে মাথায় ফুল পরে"।' কিন্তু কমল-মণি ভ্রাতৃজায়ার চুল বাঁধিয়া দিয়াই আদর-যত্ন শেষ করেন নাই। তিনি সূর্য্যমুখীর কণ্টক উদ্ধার করিতে, সতীন-কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে আসিয়া-ছিলেন। বিধিমত তাহার চেষ্টা করিলেন। তিনি সুকৌশলে অথচ গভীর প্রীতি ও সমবেদনার সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর মনের কথা বাহির করিয়া লইলেন। 'ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে, কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল।' কিন্তু তথাপি তিনি নিজের কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। কুন্দকে বুঝাইয়া কলিকাতা যাইতে রাজী করাইলেন, তাহাকে নিজের স্কন্ধে লইবার সব ঠিকঠাক করিলেন। এইখানে স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী কমলমণির দর্শন পাইলাম। সাধে কি গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'সোণার কমল?' গ্রহবৈগুণ্যে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা ঘটিল না, তাঁহার কি দোষ?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে কমলমণি-সূর্য্যমুখী উভয়েই 'হরিদাসী বৈষ্ণবী'র গান শুনিয়া অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়া গেলেন; ইহাতে বুঝা যায় তাঁহারা অভেদাত্মা, অভিন্নরুচি। 'হরিদাসী বৈষ্ণবী'কে কুন্দের সহিত বিরলে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া, 'হরিদাসী বৈষ্ণবী' কে, তৎসম্বন্ধে যখন সূর্য্যমুখীর মনে সন্দেহ উদয় হইল, তখন তিনি কমলকে ডাকিয়া দেখাইলেন এবং পরে হীরাকে উহার সন্ধানে পাঠাইয়া কমলকে সেকথা বলিলেন। ইহাতে বুঝি সূর্য্যমুখী-কমলমণিতে কত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ।

তাহার পর (বিংশ পরিচ্ছেদ) কুন্দনন্দিনীর পলায়নের পর কমল সূর্য্যমুখীর অন্তরের বেদনা বুঝিয়া 'কলিকাতা যাওয়া স্থগিত করিলেন।' তিনি প্রকৃত হিতৈষিণীর ন্যায় সূর্য্যমুখীর কুন্দসম্বন্ধে ভুল সংস্কার দূর করিলেন কিন্তু সূর্য্যমুখীকে কুন্দের প্রতি পরুষ-বচন-প্রয়োগের জন্য অনুতপ্ত জানিয়া তাঁহাকে 'অণুমাত্র তিরস্কার করিলেন না।' সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়ের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে না বসিয়া সূর্য্যমুখীর কাতরতা ও অনুতাপ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধানের তৎপরতার জন্য তিনি গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন "যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হার দিব।" [সুন্দরীর মত অবশ্য নিজেই কুন্দের সন্ধানে বাহির হইলেন না।]

আবার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে কমলমণির দেখা পাই। তিনি পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং কিছুদিন পরে আবার সূর্য্যমুখীর মর্ম্মান্তিক-বেদনাব্যঞ্জক পত্র পাইলেন। সূর্য্যমুখী নারীজীবনের সার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, কুন্দের সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিতে কৃতনিশ্চয়া হইয়া, কাতরতার সঙ্গে কমলমণিকে লিখিতেছেন, 'তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে।' আবার ননদের সহিত সেই প্রগাঢ় প্রীতির পরিচয়। আবার কমলের আসন টলিল। আবার

স্নেহময়ী করুণাময়ী ননন্দা, উপেক্ষিতা, মর্ম্মাহতা ভ্রাতৃজায়ার মনোব্যথার লাঘব করিবার প্রয়াসে, গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। 'অতিব্যস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ;…দাসীরা বলিয়া দিল, সূর্য্যমুখী শয়ন-গৃহে আছেন। কমলমণি ছুটিয়া শয়নগৃহে গেলেন।…তুইজনে সেইখানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন—কেহ কিছু বলিলেন না। সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—কমলমণির চক্ষের জল তাঁহার বক্ষে ও কেশের উপর পড়িতে লাগিল।' (ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ)। কি গভীর সহানুভূতি! সদাহাস্যময়ী আজ অশ্রুময়ী। যাঁহারা মনে করেন, যে হাসিতে পারে, সে কাঁদিতে পারে না, তাঁহারা এই দৃশ্য দেখুন, ভ্রম ঘুচিবে।

কমলমণি স্নেহবশতঃ নিজের সহোদরের দোষ দেখিতে অন্ধ হইলেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি দাদাকেই অপরাধী করিলেন। ইহাও তাঁহার ভাজের প্রতি ভালবাসার আর একটি নিদর্শন। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ননদ-ভাজে যে কথোপকথন হইল, তাহা বড় মর্ম্মান্তিক, তাহার আর সবিস্তারে পরিচয় দিব না। পাঠক তাহাতেও দেখিবেন তুটি হৃদয়ের প্রীতি-বন্ধন কত ঘনিষ্ঠ। 'অন্তরে অন্তরে কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে, সূর্য্যমুখী কত তুঃখী। অন্তরে অন্তরে সূর্য্যমুখী বুঝিয়াছিলেন যে, কমলমণি তাঁহার তুঃখ বুঝিতেছেন।' গভীর রাত্রিতে উভয়ের বিদায়দৃশ্যেও (সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ) উভয় হৃদয়ের বেদনার পরিচয় পাওয়া যায়।

গৃহত্যাগের পূর্ব্বেও সূর্য্যমুখী কমলকে পত্র লিখিয়া গেলেন! চিরদিনই ত তিনি ননন্দাকে অসহ্য মনোবেদনা জানাইয়া আসিয়াছেন। আজ কেন তাহার অন্যথা হইবে? 'তোমাকে আর একবার দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে জানিতাম।…তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি।…তোমার কাছে

জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেইদিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়।' (অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ)। একদিন কমল সূর্য্যমুখীকে লিখিয়াছিলেন, 'তুমি দীঘির জলে ডুবিয়া মর,' আর আজ সূর্য্যমুখী কমলকে লিখিতেছেন 'যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়।' বুঝিলাম একই সুরে দুটি হৃদয় বাঁধা, স্বামিপ্রেম উভয়েরই ইষ্টমন্ত্র।

কমলমণি, গোবিন্দপুরে থাকিয়া সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর 'চারিদিকে লোক পাঠাইলেন' ও তাঁহার 'অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।' তিনি স্বামার সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। সূর্য্যমুখী যে তাঁহার হৃদয়ের অর্দ্ধেক যুড়িয়া আছেন। (ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)।

ইহার পর অনেক দিন কমলের দেখা পাই না। নগেন্দ্রনাথের যন্ত্রণার ইতিহাস আছে, সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক কষ্টের ইতিহাস আছে, কিন্তু গ্রন্থকার কমলহৃদয়ের তীব্র জ্বালার বিবরণ দেন নাই। সে নীরব যন্ত্রণা অনুধাবন করিয়া লইতে হইবে।

তাহার পর (ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ) নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর সন্ধান করিয়া শ্রান্তদেহে দীর্ণহৃদয়ে শ্রীশচন্দ্রের বাসায় ফিরিলেন। 'কমল শুনিলেন, সূর্য্যমুখী নাই। তখন আর তিনি কোন ভারই লইলেন না। সতীশকে একা ফেলিয়া, কমলমণি সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইলেন। কমলমণি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আলুলায়িত-কুন্তলে কাঁদিতে' লাগিলেন, প্রাণের দুলাল সতীশচন্দ্রও সে ক্রন্দনের বেগ প্রশমিত করিতে পারিল না। পুত্রবাৎসল্য, স্বামিপ্রীতি, ভ্রাতৃস্নেহ, গৃহিণীর কর্ত্তব্য, অতিথিসৎকার, সবই সে শোকের বেগে ভাসিয়া গেল।

তাহার পর (অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ) মেঘ-ঝড় কাটিয়া গিয়াছে, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরিয়াছেন, দত্তবাড়ীতে অনেক কাল পরে আবার সূর্য্যমুখী ফুল ফুটিয়াছে। সকলে গৃহের লক্ষ্মীকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া মহাকলরব করিতেছে। 'সকলকে বেড়িয়া বেড়িয়া কমলমণি শাঁক বাজাইতেছেন ও হুলু দিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন—এবং কখন কখন এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া, এক একবার নৃত্য করিতেছেন।' এতদিনের পর আমরা সেই রহস্যময়ী (ক্ষণে মেঘ ক্ষণে রৌদ্র), সেই হাস্যময়ী আলোকময়ী স্নেহময়ী করুণাময়ী কমলমণির আবার দেখা পাইলাম। আনন্দোৎসবের পরে ননদ-ভাজে নিদারুণ বার্ত্তা পাইয়া হতভাগিনী কুন্দনন্দিনীকে শেষ দেখা দেখিতে গেলেন, সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের আর অবতারণা করিব না। এই মধুর দৃশ্যেই শেষ করি।

'সোণার কমলে'র সব পাপড়িগুলি খুলিয়া দেখাইতে পারিলাম না। কেবল তাঁহার ভাজের প্রতি ভালবাসাই দেখাইলাম। ভরসা করি, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃপায় ঘরে ঘরে 'সোণার কমল', বা অভাব-পক্ষে (শ্যামাসুন্দরীর মত) নীল কমল ফুটিবে।

বোনে বোনে।

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে।)

গোড়ার কথা।

কাব্যে নাটকে নায়িকার সমদুঃখসুখ সখীজনের ব্যবস্থা আছে। বাস্তবজীবনেও, কুমারী কন্যা বা বিবাহিতা নারী, সই, মিতিন প্রভৃতির নিকট মনের কথা, সংসারের সুখের দুঃখের কথা বলিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করেন, তাঁহাদিগের নিকট সান্ত্বনা ও সমবেদনা লাভ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়ান, ইহা বিরল নহে। কিন্তু ঘরের কথা পরের কাণে তোলা সকল সময়ে ঠিক সুবিবেচনার কার্য্য নহে। সুতরাং পাতান সইএর পরিবর্ত্তে যদি বালিকা বা যুবতীর আত্মীয়াদিগের মধ্যে সমবেদনাময়ী বিশ্বাসপাত্রী পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকল দিকেই ভাল হয়। তাহা স্বাভাবিকও হয়, পরন্তু তাহাতে কাব্যের প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়। গৃহস্থঘরে সমবয়স্কা যা, ভাজ, ননদ ও ভগিনীর নিকট সুখের দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া বলা অসঙ্গত নহে। আবার সপত্নীর সখিত্ব বিরল হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। তবে সপত্নীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তজ্জনিত ঈর্ষ্যার অবসরই অধিক। একান্নবর্ত্তি-পরিবারে অনেক সময় যা, ভাজ ও ননদের সহিত স্বার্থের সঙ্ঘাত ঘটিতে পারে; পরন্তু তাঁহাদিগের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে লজ্জাসঙ্কোচও হইতে পারে; সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত সখিত্ব-ঘটনের পথেও বাধা আছে। কিন্তু আবাল্যসঙ্গিনী সহোদরা বা নিকটসম্পর্কীয়া ভগিনীর সহিত সখিত্ব সহজ, স্বাভাবিক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাঙ্গালা ভাষার তথা বাঙ্গালীজাতির ইতিহাসে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' প্রবাদবাক্য কতদিনের পুরাতন তাহা জানি না। কিন্তু ইহা জানি যে হিন্দুর অমূল্য ধর্ম্মসাহিত্য রামায়ণ-মহাভারতে রাম-লক্ষ্মণাদির, যুধিষ্ঠিরাদির, দুর্য্যোধনাদির, (এমন কি, 'পঞ্চোত্তরশত' কৌরব-পাণ্ডবের) সৌভ্রাত্রের অতি সুন্দর, অতি মহৎ দৃষ্টান্তাবলি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, ভগিনীতে ভগিনীতে সদ্ভাব ও একাত্মতার কোন দৃষ্টান্ত, যতদূর মনে পড়ে, সংস্কৃত বা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। (১) অযোধ্যার রাজ-পুরীতে চারি ভগিনী (ও যা) সীতা-ঊর্ম্মিলা-মাণ্ডবী-শ্রুতকীর্ত্তির সদ্ভাব-সম্প্রীতি-সম্বন্ধে আদিকবি বাল্মীকি নীরব! ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে একথাও বলা যায় যে, 'সৌভ্রাত্রে'র ন্যায় 'সৌভাগিন্য' পদ সংস্কৃতভাষায় কখনও রচিত হয় নাই!

ইহা হইতে অবশ্য এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছি না যে, ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসা হিন্দুগৃহে অভাবনীয় ঘটনা। আসল কথা, আমাদের সমাজে সাধারণতঃ বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকাতে ভাই ভাইএর ন্যায় ভগিনীতে ভগিনীতে শৈশব ভিন্ন অন্যবয়সে বহুদিন একত্রবাসের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প, তজ্জন্যই ভগিনীতে ভগিনীতে সৌহার্দ্দ-সাহচর্য্যের চিত্র সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অঙ্কিত হয় নাই এবং 'সৌভ্রাত্রে'র ন্যায় 'সৌভাগিন্য' পদ রচিত হয় নাই। কুলীনের ঘরে বয়ঃস্থা কুমারী বা নাম-মাত্র বিবাহিতা ভগিনীদিগের চিরজীবন একত্রবাস ঘটিত এবং এখনও

---

(১) 'রত্নাবলী'র শেষ অঙ্কে (অবন্তিনৃপাত্মজা) বৎসরাজমহিষী বাসবদত্তা, স্বামীর প্রণয়পাত্রী সাগরিকা অর্থাৎ রত্নাবলীকে (সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহুর কন্যা) ভগিনী (অবশ্য সহোদরা নহে) বলিয়া জানিতে পারিয়া, প্রণয়ের প্রতিযোগিনী হইলেও তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যাত্যাগ করিয়া 'প্রিয়বহিনী' বলিয়া স্নেহ ও বহুমান প্রদর্শন করিয়াছেন—সংস্কৃত সাহিত্যে এই একটিমাত্র স্থলে ভগিনী-স্নেহের সামান্য প্রসঙ্গ আছে।

হয়ত কোন কোন স্থলে ঘটে। ধনিগৃহে ঘরজামাই রাখিলেও ভগিনীগণের এরূপ একত্রবাস ঘটে। কিন্তু এগুলি আমাদের সমাজে সাধারণ বিধি নহে—বিশেষ বিধি, exception rather than the rule; এই জন্যই 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধের আরম্ভে বলিয়াছি বাঙ্গালী নারীর পক্ষে নিজের ভগিনী অপেক্ষা স্বামীর ভগিনীর সহিত একত্রবাসের সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং বোনে বোনে সখ্য-সম্ভাব অপেক্ষা ননদ-ভাজে সখ্য-সদ্ভাবের সুযোগ অধিক, এবং সমাজের কল্যাণকল্পে, গার্হস্থ্য-জীবনের সুসঙ্গতির পক্ষে, ননদ-ভাজের সখ্য-সদ্ভাবের প্রয়োজনীয়তাও অধিক।

পক্ষান্তরে, বিলাতী সমাজে নারীগণ নিতান্ত অল্পবয়সে বিবাহিত হইয়া পতিগৃহে যান না, তাঁহারা যৌবনেও অনূঢ়া থাকেন, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে চিরজীবন কুমারীব্রত পালন করেন, সুতরাং সে সমাজে দুই ভগিনীর অধিক বয়সেও অবিচ্ছিন্ন একত্রবাস বিরল নহে এবং দুই ভগিনীর সখ্য-সদ্ভাবের দৃষ্টান্তও কি সমাজে কি সাহিত্যে বিরল নহে। আবার ননদ-ভাজের একত্রবাস উক্ত সমাজে অত্যন্ত বিরল, সুতরাং উভয়ের সখ্য-সদ্ভাবের দৃষ্টান্তও কি সমাজে কি সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে শেষোক্ত কথার আলোচনা করিয়াছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যের অনুরূপ (এবং বাস্তবজীবনেরও অনুরূপ) সখীর ব্যবস্থা বহুস্থলে আছে। আবার বাস্তবজীবনের নজিরে আত্মীয়াদিগের সহিত সখিত্ববন্ধনের ব্যবস্থাও বহুস্থলে আছে। ইহার সাধারণ সূত্র এইভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, নায়িকা অনূঢ়া হইলে সখীর ব্যবস্থা, বিবাহিতা হইলে ননদ, ভাজ, সতীন (২) প্রভৃতি আত্মীয়াদিগের সহিত সখিত্বের

(২) 'শাশুড়ী-বৌ' প্রবন্ধে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যাএর চিত্র কোথাও অঙ্কিত করেন নাই। তাঁহার আখ্যায়িকাবলিতে নায়কগণ প্রায়ই এক মাএর এক ছেলে। দুই এক

ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম আছে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গত কারণও আছে। যথা, 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' ও 'মৃণালিনী'তে নায়িকা বিবাহিতা হইলেও গ্রন্থশেষে স্বামীর সহিত মিলিতা, স্বামিগৃহে গৃহীতা ; সুতরাং তাঁহাদিগের যা, ননদ, ভাজ প্রভৃতি আত্মীয়াদিগের সহিত সখিত্বের সুযোগ ঘটে নাই, অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র চারিখানি আখ্যায়িকায় ('কপালকুণ্ডলা,' 'বিষবৃক্ষ,' 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠে') ননদ-ভাজ সম্পর্কের সুন্দর চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। 'সতীন ও সংমা' প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২১) দেখাইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র দুইখানি আখ্যায়িকায় ('দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে') সোণার সতীনের সুন্দর চিত্রও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে অনুসন্ধান করিব, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আখ্যায়িকাবলিতে ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন কি না।

এইখানে একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিবার প্রয়োজন আছে। সহোদরায় সহোদরায় গভীর স্নেহপ্রীতি বড় স্বাভাবিক, সুন্দর ও শোভন। কুলীন-সম্প্রদায় মেলবন্ধনের আঁটাআঁটিতে বাধ্য হইয়া বোন-সতীনের সৃষ্টি করিয়া এই প্রকৃতিমধুর স্নেহসম্পর্ককে তিক্ত (৩) করিয়া তুলিতেন, ইহা বড়ই নিন্দনীয় ও শোচনীয়। কিন্তু যে সকল আখ্যায়িকাকার দুই ভগিনীকে এক নায়কে অনুরাগিণী করিয়া এমন মধুর স্নেহসম্পর্ককে ঈর্ষ্যাবিষময়

স্থলে একান্নবর্ত্তি-পরিবারে সহোদর ('রজনী'তে) বা খুড়তুত জ্যেঠতুত ('কৃষ্ণকান্তের উইলে') ভ্রাতা থাকিলেও যাএর প্রসঙ্গ নাই।

(৩) মেয়েলি ছড়ায় বলে—

নিম তিত নিসিন্দে তিত তিত মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিত বোন-সতীনের ঘর॥

করিয়া ফেলেন, বিশেষতঃ বিধবা যুবতী শ্যালিকাকে ভগিনীপতির প্রতি প্রণয়শালিনীরূপে চিত্রিত করিয়া দাম্পত্যজীবনের সুখস্বর্গে কামের নরক সৃষ্টি করিয়া বসেন, তাঁহাদিগের কার্য্য তদপেক্ষাও গর্হিত নহে কি ?

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'কিরণ হিরণ দুই বোন, দুই শরীরে এক মন' হইলেও দুই সহোদরা এক নায়কের প্রতি প্রেমে প্রতিযোগিনী হইয়া, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতা হইলেন। পরে যদিও কিরণময়ী অনুজার প্রতি স্নেহের জন্য স্বার্থবিসর্জ্জন দিলেন ও ছদ্মবেশে বিপৎসঙ্কুল স্থান হইতে অনুজার উদ্ধারসাধন করিলেন, তথাপি তিনি নায়কের সহিত পরজন্মে পরিণীতা হইবেন, এই আশায় অনূঢ়া থাকিলেন, ইহাতেই তাঁহার ভগিনী-পতির প্রতি অনুরাগ কতদূর বদ্ধমূল তাহা বুঝা যায়।

৺দামোদর মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত 'দুই ভগ্নী'তে বিধবা যুবতী শ্যালিকাকে ভগিনীপতির প্রতি প্রসক্তা করিয়া স্বামিসোহাগিনী পত্নীর 'হাড়ে হাড়ে আগুন জ্বালাইয়া' শান্তিময় সংসারকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছেন। বালবিধবা অষ্টাদশী যুবতী জ্যেষ্ঠা ভগিনী কমলিনী সধবা কনিষ্ঠা ভগিনী বিনোদিনী সম্বন্ধে মুখে বলিতেছেন, 'আমি তাহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসি', অথচ ভগিনীপতির প্রতি অবৈধ প্রণয়ে অন্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিতেছেন, 'বিনোদ আমার সুখের পথে কণ্টক, আমার বাসনার অন্তরায়, সে আমার পরম শত্রু'। তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় ও (মাধী ঝি মন্থরার প্ররোচনায়) ষড়যন্ত্র করিয়া ভগিনীর সর্ব্বনাশসাধন করিলেন।

'বঙ্গদর্শন' নবপর্য্যায়ের সম্পাদক ৺ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার সধবা 'ইন্দু'কেও সহোদরা ভগিনীর স্বামীর প্রতি অনুরাগবতী করিয়াছেন।

আরও দুইজন খ্যাতনামা সম্পাদক দুইখানি আখ্যায়িকায় শ্যালিকা-ভগিনীপতির ব্যভিচারের ব্যাপার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি

মাসিক পত্রিকায় ক্রমশঃ-প্রকাশ্য গল্পে জনৈক জাঁদরেল লেখক যুবতী বিধবা শ্যালিকাকে ভগিনীপতির আলিঙ্গনবদ্ধা ও চুম্বনলাঞ্ছিতা করিয়াছেন এবং 'বৈষ্ণবী ভাবে' বিভোর হইয়া গুরুদেবের মুখ দিয়া অভয় দিয়াছেন যে চুম্বন-আলিঙ্গনে বিধবার কম্পপুলকাদি 'সাত্ত্বিকী বিকারে'র সঞ্চার হইলেও তিনি অপাপবিদ্ধা! ইহার পরেও শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইয়াছে। গল্পটি আজও শেষ হয় নাই, জানি না আরও কতদূর গড়াইবে। (এস্থলে ভগিনীরা সহোদরা নহেন।)

ছোটগল্পের মধ্যেও এই বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে; তাহার প্রমাণ দুইজন নামজাদা সম্পাদকের লিখিত দুইটি ছোটগল্পে পাওয়া যায়। (একটিতে ভগিনীরা সহোদরা, অপরটিতে সহোদরা নহেন।) উভয়ত্রই শ্যালিকা বিধবা, তবে একটিতে বিধবা শ্যালিকা ও বিপত্নীক ভগিনীপতি পরিণত বয়সে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। যাহা হউক, এই শেষের উদাহরণটীতে উভয়েই 'সংযমে'র পরিচয় দিয়াছেন এবং এক্ষেত্রে অবশ্য ভগিনীতে ভগিনীতে ঈর্ষ্যার অবসর নাই।

বাঙ্গালীর ঘরে, বাস্তবজীবনে, এরূপ শ্যালিকাপ্রেম ঘটা অসম্ভব নহে; ইহার জন্য বিলাতী আখ্যায়িকাকার চার্লস্ ডিকন্সের জীবন-বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিয়া নজির খাড়া করিবার প্রয়োজন নাই; সুতরাং উল্লিখিত লেখকসম্প্রদায় বাস্তব (realistic) চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এই অজুহত দিতে পারেন। তথাপি বাস্তবতার (realism) দোহাই দিয়া এরূপ কদর্য্য ব্যাপার বিবৃত করা যে সমাজ ও সাহিত্যের অকল্যাণকর, একথা আমরা বলিতে বাধ্য। তবে ক্রমশঃ-প্রকাশ্য গল্পের লেখক ভিন্ন অন্য কয়েকজন লেখক এবংবিধ জুগুপ্সিত ব্যাপারের বর্ণনা যথাসাধ্য সংক্ষেপে সারিয়াছেন এবং প্রায় সকলেই এই পাপাচরণের বিষম পরিণাম প্রকটিত করিয়া, 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ'—

শ্রীবিষ্ণু—সীতাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন শূর্পণখাদিবৎ—সৎকাব্যে অনুসরণীয় এই সুনীতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন, একথা অকপটে স্বীকার করিতে হইবে। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ইঁহারা অনেকেই, স্বামিসুখ-বঞ্চিতা হইয়াও সধবা ভগিনী বিধবা ভগিনীকে স্নেহ করিয়াছেন, তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, এবং লালসার শাস্তি হইলে বিধবা ভগিনী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছেন, এই ভাল দিক্‌টাও দেখাইয়াছেন। আমরা বড় গলা করিয়া বলিতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র কুত্রাপি এই অস্বাস্থ্যকর (unhealthy) কল্পনাকে প্রশ্রয় দেন নাই, এই স্নেহ-সম্পর্কের এরূপ উৎকট পরিণাম প্রকটিত করেন নাই, প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর বিমল প্রীতিস্নেহকে এরূপ কামগন্ধদুষ্ট ও ঈর্ষ্যাকলুষিত করেন নাই। (৪)

---

(৪) বিলাতী কবি টেনিসনের 'The Sisters' নামে দুইটি কবিতা আছে। একটী তাঁহার প্রথম বয়সের, অপরটি শেষবয়সের রচনা। প্রথমটিতে ভগিনীহত্যার জন্য অপরা ভগিনী ভগিনীঘাতককে বধ করিয়া প্রতিশোধ লইয়াছে। এই নৃশংস রক্তপাত নারীজনোচিত ও ধর্ম্মানুগত না হইলেও ভগিনীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অপরটিতে প্রণয়ী দুই যমজ ভগিনীকে চকিতের মত এক লহমা দেখিয়া একটিকে ভালবাসিয়াছিল; কিছুদিন পরে আবার তাহাদিগের একটিকে দেখিয়া পূর্ব্বপ্রণয়পাত্রী-ভ্রমে তাঁহাকে প্রেমজ্ঞাপন করিল; আরও কিছুদিন পরে যথার্থ পূর্ব্ব-প্রণয়পাত্রীর দর্শন পাইয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রেমজ্ঞাপন করিল ও বিবাহ করিল। এই যুবতী কিন্তু, পূর্ব্বে যে তাঁহার প্রণয়ী ভগিনীর প্রণয়ী ছিল, তাহা জানিলেন না। অপরা ভগিনী ভগ্নহৃদয়া হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন বিবাহিতা ভগিনী মাতার নিকট সকল কথা শুনিয়া পতির প্রতি বীতশ্রদ্ধা হইলেন। এই কবিতায় উভয় ভগিনী এক নায়কে বদ্ধপ্রণয়া হইলেও এবং এক নায়ক (ভ্রমক্রমে) উভয়কেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রেমজ্ঞাপন করিলেও ভগিনীদ্বয়ের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি (কিরণময়ী-হিরন্ময়ীর মত) ঈর্ষ্যার সঞ্চার হয় নাই—ইহাই কবিতাটির আখ্যানবস্তুর বিশিষ্টতা। আমাদের দেশের কল্পনাপ্রবণ লেখকগণ এই বৃত্তান্ত অবলম্বনে একটি

এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় কোথায় দুই ভগিনীর অবতারণা করিয়াছেন।

‘দুর্গেশনন্দিনী’তে তিলোত্তমার মাতা ও বিমলা সহোদরা না হইলেও ভগিনী—উভয়েই শশিশেখর ভট্টাচার্য্য ওরফে অভিরামস্বামীর ঔরসজাতা। (পুস্তকের ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিচ্ছেদ—‘বিমলার পত্র’—দ্রষ্টব্য।) তিলোত্তমার মাতা বরাবর জীবিতা থাকিলে বিমলার বোন-সতীনের ঘর হইত। কিন্তু সুখের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র বোনে বোনে পতি-প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কল্পনা না করিয়া বিমলার সহিত বীরেন্দ্রসিংহের প্রণয় ও পরিণয় ঘটিবার পূর্ব্বেই তিলোত্তমার মাতাকে জগৎ হইতে অপসারিত করিয়াছেন। অতএব এক্ষেত্রে উভয় ভগিনীর একত্রাবস্থানের অবসর নাই।

‘মৃণালিনী’তে, নায়িকার মাতার সহিত ‘অরুন্ধতী মাসি’র অবশ্য বোন-সতীন সম্পর্ক ছিল না। পরন্তু তিনি মৃণালিনীর মাতার সহোদরা নহেন, দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী। গ্রন্থের কথাগুলি এই—‘অরুন্ধতী নামে আমার এক প্রাচীন কুটুম্ব ছিলেন। তিনি সম্বন্ধে মার ভগিনী হইতেন। আমাকে বালককাল হইতে লালন-পালন করিয়াছিলেন।’ [৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।] এক্ষেত্রেও গ্রন্থকার দুই ভগিনীর একত্রাবস্থানের উল্লেখ করেন নাই। গ্রন্থপাঠে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে অনুমান হয় যে, মৃণালিনীর মাতা গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই পরলোকগতা এবং তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে মাসিই মৃণালিনীকে মানুষ করিয়াছিলেন।

‘রজনী’তে স্পষ্টই আছে, রজনীর মাতার মৃত্যু হওয়াতে তাহার মাসি তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। ‘তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল…

ছোটগল্প লিখিতে পারেন না কি? তাহাতে যথেষ্ট করুণরসের অবসর হয়, অথচ দুর্নীতি বা কুরুচির প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল।' (২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ)। অতএব এক্ষেত্রেও উভয় ভগিনীর একত্রাবস্থানের অবসর নাই। তিলোত্তমার মাতা, মৃণালিনীর মা ও মাসি, রজনীর মা ও মাসি ইহাঁরা সকলেই নিতান্ত অপ্রধানা পাত্রী। সুতরাং এসকল স্থলে দুই ভগিনীর চিত্র অঙ্কিত করিতে গেলে গ্রন্থকারের সদ্‌বিবেচনার কার্য্য হইত না। 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' দাসী অমলার কয়েকটি কন্যার উল্লেখমাত্র আছে (৫ম পরিচ্ছেদ)। কিন্তু ইহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

'কপালকুণ্ডলা'য় নায়ক নবকুমারের দুই ভগিনী ছিল। 'জ্যেষ্ঠা বিধবা, তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না, দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা। কেননা, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।' [২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।] গ্রন্থকার যখন জোর-কলমে লিখিয়াছেন, জ্যেষ্ঠার সহিত আমাদের পরিচয় হইবে না, তখন এক্ষেত্রে দুই ভগিনীর একত্রাবস্থান হইলেও তাঁহাদিগের সদ্ভাব বা অসদ্ভাবের চিত্রে আমরা বঞ্চিত হইলাম ; শ্যামাসুন্দরীর যে দুই একবার দেখা পাইব, তাহাতে ননদ-ভাজের সদ্ভাবের চিত্রেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আসল কথা, এই গ্রন্থে শ্যামার দুঃখে দুঃখিনী ভাজকে সান্ত্বনাদায়িনী ও সাহায্যকারিণী সখীর ভূমিকায় অঙ্কিত করিয়াই গ্রন্থকার শ্যামার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, তাহার প্রতি বড়দিদির স্নেহ-সমবেদনার প্রয়োজন বুঝেন নাই।

'চন্দ্রশেখরে' সুন্দরী ও রূপসী দুই ভগিনী। 'সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন।......সুন্দরীর আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। তাহার নাম রূপসী। রূপসী শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত।' [২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] উভয় ভগিনীকে কেবল একবার একত্র দেখা যায়, তখন

সুন্দরী শৈবলিনীর উদ্ধারার্থ ভগিনীপতিকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে ভগিনীর শ্বশুরালয়ে উপস্থিত। যদিও সুন্দরী "আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব—তাহার বিষয়ে বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি" এই অজুহত দেখাইলেন, তথাপি তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগিনীপতির সহিত সাক্ষাৎকার। 'রূপসী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া সাদরে গৃহে লইয়া গেল।' প্রতাপকে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধানে পাঠাইয়া 'সুন্দরী কিছুদিন ভগিনীর নিকটে থাকিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া শৈবলিনীকে গালি দিল।......রূপসী বলিল, "দিদি তুই বড় কুঁদুলী।"' [২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] অবশ্য, দিদিকে 'তুই' বা 'কুঁদুলী' বলায় রূপসীর দিদির প্রতি বিরাগ প্রকাশিত হইতেছে না, দিদিকে 'সাদরে' গ্রহণ করায় বরং ভালবাসাই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে দুই ভগিনীর এই চিত্রে আমাদের তৃপ্তি হয় না। এ ক্ষেত্রেও আসল কথা, গ্রন্থকার শৈবলিনীর সহিত সুন্দরীর সখিত্ব-সম্পর্ক পরিস্ফুট করিতেই, ননদ-ভাজের সদ্ভাব-সম্প্রীতি চিত্রিত করিতেই ব্যগ্র, দুই ভগিনীর স্নেহ-সম্পর্কের চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য প্রয়াসী নহেন।

'দেবীচৌধুরাণী'তে নিতান্ত অপ্রধানা পাত্রী ফুলমণি অলকমণি দুই ভগিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। একটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার ভগিনীযুগলকে আমাদের সম্মুখীন করিয়াছেন। [১ম খণ্ড ১০ম পরিচ্ছেদ।] সেখানে গ্রন্থকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য, প্রফুল্লের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে একটি আজগবী বিবরণের সৃষ্টি করা। এইজন্য, 'সীতারামে' 'ডাকিনী' শ্রীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে রামচাঁদ-শ্যামচাঁদের কথোপকথনের ন্যায়, উভয় ভগিনীর কথোপকথন এই গ্রন্থে বর্ণিত। ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসা চিত্রিত করা এখানে গ্রন্থকারের আদৌ অভিপ্রেত নহে। এই নিতান্ত নগণ্য চিত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়া পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে

উক্ত পরিচ্ছেদের শেষার্দ্ধ পাঠ করিতে পারেন। ইতর লোকের বাস্তব (realistic) চিত্র হিসাবে ইহা উপভোগ্য এবং অজ্ঞলোকের হৃদয়ে অদ্ভুত (marvellous) ব্যাপারের কিরূপে উদ্ভব হয় তাহার দার্শনিক দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহা শিক্ষাপ্রদ। (তবে এক্ষেত্রে ফুলমণি নিজেকে বাঁচাইবার জন্য 'রচাকথা'র, মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছে। সুতরাং ঠিক bona fide দার্শনিক দৃষ্টান্তও বলা যায় না।)

এ পর্য্যন্ত দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে অপ্রধানা পাত্রীদিগের বেলায় কোথাও কোথাও ভগিনীর উল্লেখ আছে, কিন্তু সে সব স্থলে ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার চিত্র হয় আদৌ অঙ্কিত হয় নাই, অথবা নিতান্ত ক্ষীণ রেখায় অঙ্কিত হওয়াতে তাহা মোটেই সুন্দর ও তৃপ্তিকর নহে।

নায়িকা ও প্রতিনায়িকাদিগের বেলায় দেখা যায়, প্রায় সকলেই এক মাএর এক মেয়ে, অন্ততঃ তাঁহাদিগের ভগিনী থাকার কথা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত নহে। (৫) তিলোত্তমা, আয়েষা, মৃণালিনী, মনোরমা, কপাল-কুণ্ডলা, মতিবিবি, শৈবলিনী, দলনী, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, রজনী, ললিত-লবঙ্গলতা, হিরণ্ময়ী, রাধারাণী, আর কত নাম করিব?—সকলেরই এই দশা।

যাহা হউক, একটু ধীরচিত্তে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, কেবল দুইখানি আখ্যায়িকায় নায়িকার ভগিনীর প্রসঙ্গ আছে, শুধু প্রসঙ্গ কেন, ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার সুন্দর চিত্র আছে। 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরার কামিনীনাম্নী ভগিনী আছে, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের যামিনীনাম্নী

(৫) শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকেও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা। সংস্কৃত কাব্যনাটকেও বড় ব্যতিক্রম দেখি না। মিরাণ্ডা, ডেস্‌ডেমোনা, জুলিয়েট, পোর্শিয়া, ওফেলিয়া, জেসিকা, শকুন্তলা, মালতী, কাদম্বরী, প্রভৃতি কাহারও ভগিনী নাই।

ভগিনী আছে। গ্রন্থ দুইখানি হইতে ইহারা সধবা কি বিধবা কি কুমারী তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা যামিনী বিধবা এবং ইন্দিরার কনিষ্ঠা কামিনী সধবা কিন্তু পিত্রালয়বাসিনী। কামিনী সম্বন্ধে ইন্দিরা বলিয়াছেন,—'আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট।' [২০শ পরিচ্ছেদ।] ইন্দিরা যখন উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিল, তখন গ্রন্থারম্ভ (১ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে কামিনী তখন সতের বৎসরে পড়িয়াছে, অতএব অবশ্যই বিবাহিতা। ধনগর্ব্বিত পিতা যে কারণে ইন্দিরাকে এতদিন শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই, সম্ভবতঃ সেই কারণেই কামিনীকেও এতদিন শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই।

স্থূলতঃ উভয়ত্রই গ্রন্থের শেষার্দ্ধে নায়িকার ভগিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইন্দিরার শ্বশুরবাড়ীযাত্রা-কালে (অর্থাৎ ১ম পরিচ্ছেদে) কামিনীর সামান্য একটু প্রসঙ্গ আছে। তাহার পর, মহাস্ফূর্ত্তিতে স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিয়া ঘোর বিপদে পড়িয়া ইন্দিরা যখন পিতৃগৃহ ও পতিগৃহ হইতে চ্যুতা, প্রবাসিনী পরান্নজীবিনী পরাবসথশায়িনী, স্বামীর সহিত মিলনের আশা সুদূরপরাহত, তখন সেই দুর্দ্দিনে স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী সতত শুভানু-ধ্যায়িনী সখী সুভাষিণী তাঁহার সান্ত্বনাদায়িনী ও পরমসহায়। যখন তাঁহার সুদিন আসিল, তখন কনিষ্ঠা ভগিনী কামিনী তাঁহার সুখে সহচারিণী ও সহকারিণী। পক্ষান্তরে, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের সুখের দিনে, স্বামিসৌভাগ্যের দিনে, সখীর প্রয়োজন নাই—গোবিন্দলালের প্রগাঢ় প্রণয়ে তাঁহার হৃদয় এমন ভরপূর যে, তিনি সখীর অভাব অনুভব করেন না, ননদের সহিত মাখামাখিরও প্রয়োজন বুঝেন না। কিন্তু তাঁহার ঘোর দুঃখের দিনে—সুভাষিণীর মত সখীর ও কমলমণির মত ননদের অভাব জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী দ্বারা পূর্ণ হইল। (এই বৈচিত্র্যসংসাধনের জন্যই গ্রন্থকার ভ্রমরের ননদ শৈলবতীর চিত্র 'বিষবৃক্ষে' কমলমণির চিত্রের

ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করেন নাই।) 'ইন্দিরা'র দুঃখে আরম্ভ, সুখে অবসান—'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সুখে আরম্ভ, দুঃখে অবসান। 'ইন্দিরা'য় দুই ভগিনীর ভালবাসার চিত্র সুখের চিত্র, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দুই ভগিনীর ভালবাসার চিত্র দুঃখের চিত্র। 'ইন্দিরা'য় সুখের সময়ে নর্ম্মসখী কনিষ্ঠা ভগিনী, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দুঃখের দিনে সান্ত্বনাদায়িনী জ্যেষ্ঠা ভগিনী। এই বৈচিত্র্যও কবির কলাকৌশলের পরিচায়ক।

এই অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল দুইখানি আখ্যায়িকায় নায়িকার ভগিনীর অবতারণা করিয়াছেন। আমাদের সমাজে যখন বাস্তবজীবনে ননদভাজে একত্রবাসের তুলনায় বোনে বোনে একত্রবাসের সম্ভাবনা অল্প, তখন বঙ্কিমচন্দ্র স্ব-প্রণীত আখ্যায়িকাবলিতে ননদ-ভাজের ভালবাসার চারিটি চিত্র ও ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার দুইটি মাত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া পরিমাণজ্ঞানেরই (Sense of proportion) পরিচয় দিয়াছেন।

এক্ষণে এই দুইটি চিত্রের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

(১) 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরা ও কামিনী।

সুখের চিত্র।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইন্দিরার বিবাহিত অবস্থায় পিত্রালয়বাসকালে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী কামিনীর সামান্য একটু প্রসঙ্গ আছে। ইন্দিরা যখন ধনগর্ব্বিত পিতার বিবেচনার দোষে পূর্ণযৌবনেও পিতৃগৃহবাসিনী, স্বামিসন্দর্শনের জন্য লালায়িতা, তখন তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর নিকট মনের দুঃখ জানাইলে স্বাভাবিক ও শোভন হইত। কিন্তু ইন্দিরা নিজ মুখেই কবুল করিয়াছে, 'আমি অত্যন্ত মুখরা।' [১৪শ পরিচ্ছেদ।] ইন্দিরার চরিত্রের এই বিশিষ্টতাটুকু প্রথম হইতেই ফুটাইবার জন্য গ্রন্থকার তাঁহাকে

কনিষ্ঠা ভগিনীর কাছে হৃদয়বেদনা প্রকাশ না করাইয়া সরাসরি স্নেহময়ী মাতার কাছে বলাইয়াছেন,—"মা, টাকা পাতিয়া শুইব।" [১ম পরিচ্ছেদ।] (এখানে ভগিনীর সখিত্বের বিশেষ প্রয়োজন নাই বলিয়া গ্রন্থকার নায়িকার ভগিনী যে নায়িকার প্রায় সমবয়স্কা ও যুবতী একথা প্রকাশ করিলেন না।)

তাহার পর, এই প্রথম পরিচ্ছেদেরই শেষভাগে শ্বশুরবাড়ী-যাত্রাকালে যখন ইন্দিরার 'প্রাণটা বুঝি আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল,' তখন সেই সুখের দিনে কামিনীর সামান্য একটু প্রসঙ্গ আছে। 'আমার ছোট বহিন, কামিনী বুঝি তা বুঝিতে পারিয়াছিল ; বলিল, "দিদি ! আবার আসিবে কবে ?" আমি তাহার গাল টিপিয়া ধরিলাম। কামিনী বলিল, "দিদি, শ্বশুরবাড়ী কেমন, তাহা কিছু জানিস্ না ?" আমি বলিলাম, "জানি সে নন্দনবন" ইত্যাদি। কামিনী হাসিয়া বলিল, "মরণ আর কি ?"' এই কথাবার্ত্তার ভাবে দুই ভগিনীর ভালবাসার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইন্দিরা-কর্ত্তৃক কামিনীর গাল টিপিয়া ধরা অত্যাচারের চিহ্ন নহে, আদরের লক্ষণ—সুভাষিণী কর্ত্তৃক ইন্দিরাকে সোফা হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়ার মত (১৩শ পরিচ্ছেদ) স্নেহের নিদর্শন। আবার কামিনীর মুখ-নিঃসৃত 'মরণ আর কি ?' গালি নহে ; সুভাষিণীও সময়বিশেষে 'মরণ আর কি !' 'আ ম'লো !' ইত্যাদি গালি দিয়াছে। ইহা সোণার মার 'হারামজাদী' গালির মত আন্তরিক বিরাগের সাক্ষ্য নহে ; ইহা 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিলোত্তমার বিমলার প্রতি প্রযুক্ত "তুমি নিপাত যাও" অভিসম্পাতের মত, ভালবাসার পরিচায়ক। 'কামিনী বড় রঙ্গ ভালবাসে' (২০শ পরিচ্ছেদ)—তাহা এই সামান্য কথাবার্ত্তা হইতে, তাহার ক্ষুদ্র প্রশ্ন দুইটি হইতে বুঝা গেল। ইহা সূচনা-মাত্র। পরে গ্রন্থের শেষভাগে তাহার রঙ্গপ্রিয়তার বিশদ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্ফূর্তির প্রাণে ভরাযৌবনে স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিয়া ইন্দিরা যখন ঘোর বিপদে পতিত হইয়া অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে পিত্রালয় ও পতিগৃহ হইতে বহুদূরে অবস্থিতা, তখন তাঁহার সমদুঃখসুখা সখী সুভাষিণী। পিত্রালয় হইতে বহুদূরে অবস্থানকালে সহোদরা ভগিনীর সখিত্ব অবশ্য অসম্ভব। তাহার পর শুভানুধ্যায়িনী সখী সুভাষিণীর সহায়তায় তিনি 'পতি-উদ্ধার' করিলেন এবং পতিপ্রেমলাভে কৃতার্থা হইয়া পিত্রালয়ে পৌছিয়া পতির সহিত বন্দোবস্তমত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সুখের দিনে আবার আমরা নায়িকার কনিষ্ঠা ভগিনীর দর্শন পাই এবং দুই ভগিনীর প্রীতি-সম্পর্ক ও একাত্মতার পূর্ণ পরিচয় পাই।

ইন্দিরা বলিতেছেন,—'সব কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কামিনীকে বলিলাম।...সে বলিল, "দিদি! যখন মিত্রজা এত বড় গোবরগণেশ, তাঁকে নিয়া একটু রঙ্গ করিলে হয় না?" আমি বলিলাম, "আমারও সেই ইচ্ছা।" তখন দুই বহিনে পরামর্শ আঁটিলাম'। [২০শ পরিচ্ছেদ।] বাপ-মায়ের কাছে ইন্দিরা নিজে সব কথা বলিলে নির্লজ্জতার চূড়ান্ত হইত, তাই সে ভার কামিনীর উপর পড়িল। 'বাপমাকেও একটু শিখাইতে হইল। কামিনী তাঁহাদিগকে বুঝাইল যে প্রকাশ্যে গ্রহণ করাটা এখনও হয় নাই। সেটা এইখানে হইবে। আমরাই তাহা করিয়া লইব।' ইত্যাদি। বুঝা গেল, এখন প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর সহিতই নায়িকার সকল মন্ত্রণা, ভগিনীই তাঁহার পরম সহায়। ভগিনীও সাহ্লাদে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে তৎপর। (এখন উভয়ে সমপ্রাণ হইয়া রঙ্গরসে প্রবৃত্ত হইবে, সেইজন্য গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদের আরম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভগিনী নায়িকার প্রায় সমবয়স্কা ও যুবতী।)

যথাসময়ে উপেন্দ্র বাবু আসিলে পরামর্শমত কার্য্য হইল। কামিনী রহস্য গোপন করিয়া মিত্রজাকে বিদ্যাধরীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে এক আজগবী গল্প বলিল এবং কোন্ স্থানে অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল তাহাও দেখাইয়া দিতে সম্মত হইল।

'এই বলিয়া কামিনী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া গেল—"আগে তুই যা। তা'রপর আলো নিয়ে উপেন্দ্র বাবুকে লইয়া যাইব।" আমি আগে মন্দিরে গিয়া বারেণ্ডায় বসিয়া রহিলাম। সেইখানে আলো ধরিয়া কামিনী আমার স্বামীকে আমার কাছে লইয়া আসিল।...কামিনী চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আয় দিদি! উঠে আয়। ও মিন্‌সে কুমুদিনী চেনে, তোকে চেনে না।" তিনি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! দিদি কে?" কামিনী রাগ করিয়া বলিল, "আমার দিদি—ইন্দিরে। কখনও নাম শোননি?" এই বলিয়া দুষ্টা কামিনী আলোটা নিবাইয়া দিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল।...কামিনী রাগে দশখানা হইয়া বলিল, "...এ কুমুদিনী না,—ইন্দিরে—ইন্দিরে—ইন্দিরে !!! তোমার পরিবার! আপনার পরিবার চিন্‌তে পার না?"' [২০শ পরিচ্ছেদ।]

দুই ভগিনীতে কেমন সোৎসাহে একযোগে কায করিতেছে, কামিনী দিদির সুখে কেমন গা ঢালিয়া দিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা গেল।

পর-পরিচ্ছেদে মিত্রজার সহিত 'বাগ্‌যুদ্ধে' রঙ্গপ্রিয়া কামিনীর রঙ্গের অন্তরালে দিদির সুখে সুখবোধ স্পষ্ট প্রতীয়মান। মিত্রজার সহিত রঙ্গের মধ্যে মধ্যে "ও দিদি! মিত্রজার একটু বুদ্ধিও আছে দেখিতে পাই," "কামিনী তুই বড় বাড়ালি?" ইত্যাদি বাক্যে উভয় ভগিনীর হৃদ্যতার সুন্দর চিত্র ফুটিয়াছে। তাহার পর যখন মেয়ে-মজলিস বসিল, তখন উভয় ভগিনী রঙ্গপ্রিয়া ও মুখরা হইলেও এই সব 'নির্লজ্জ' ব্যাপারে যোগ

দিলেন না, তবে মধ্যে মধ্যে উভয়েই 'একবার একবার উকি মারিলেন,' কখনও বা দুই বোনে কুঞ্জের দ্বারবান্ সাজিলেন এবং দুই একটা টিপ্পনী কাটিতে ছাড়িলেন না। ইহা হইতেও দুই ভগিনীর একাত্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কিরণ হিরণ দুই বোন, দুই শরীরে এক মন' বাক্যটি এই দুই ভগিনী সম্বন্ধে বলিলেই সুপ্রযুক্ত হয়। যাহা হউক, এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত রসিকতার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতে ইচ্ছা করি না। (৬)

এই ভগিনী-যুগলের, এই মাণিকযোড়ের কথা এইখানেই শেষ করি। শেষ পরিচ্ছেদে দেখি, ইন্দিরা 'স্বামীর সঙ্গে শিবিকারোহণে শ্বশুরবাড়ী' গেলেন। বিদায়কালে কেমন করিয়া 'বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন, আঁচল ধরিয়ে' সে বেদনার দৃশ্য গ্রন্থকার এই সুখাবসান আখ্যায়িকায় দেখান নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থে অঙ্কিত দুই ভগিনীর চিত্র সুখের চিত্র। 'উপসংহারে' ইন্দিরার সখী সুভাষিণীর সহিত কয়েক বৎসর পরে পুনর্ম্মিলনের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু দুই ভগিনীতে 'আবার কবে দেখা হবে' তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার নীরব। আমরাও আর কামিনীর রঙ্গ দেখিতে পাইব না বলিয়া ক্ষুণ্ণ। তাই গ্রন্থকারের উদ্ধৃত শেলীর বাক্য কামিনীর উদ্দেশে পুনরুদ্ধৃত করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

---

(৬) এই আখ্যায়িকায় ও 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে এবং রবীন্দ্রনাথের 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে' শ্যালী-ভগিনীপতিতে কৌতুকের বাড়াবাড়ি দেখিয়া যাঁহারা 'কুরুচি' বলিয়া আপত্তি করিবেন, তাঁহারা মনে রাখিবেন, ইহা খাঁটি স্বদেশী জিনিশ, ইহাতে 'কুরুচি' থাকিলেও 'দুর্নীতি' নাই। পক্ষান্তরে শ্যালী-ভগিনীপতির অবৈধ প্রণয়—যাহা কোন কোন আখ্যায়িকাকার বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা নিতান্ত কুৎসিত এবং লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয়। বঙ্কিম-দীনবন্ধু-রবীন্দ্রনাথ এই তিনজন প্রতিভাশালী লেখকের কেহই ঐরূপ আখ্যান রচনা করিয়া নিজেদের লেখনী কলঙ্কিত করেন নাই।

Rarely, rarely, comest thou,
Spirit of Delight !
Wherefore hast thou left me now
Many a day and night ?
Many a weary night and day !
'Tis since thou art fled away.

(২) 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর ও যামিনী।

দুঃখের চিত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভ্রমরের দুঃখের দিনেই কেবল জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনীর স্নেহ-সমবেদনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সুখের দিনে, স্বামিসৌভাগ্যের দিনে, স্বামীই তাঁহার সর্ব্বস্ব, স্বামীর প্রগাঢ় প্রণয়ে তাঁহার হৃদয় এমন ভরপূর যে, সুখদুঃখভাগিনী সখী, ননদ, ভগিনী, কাহারও প্রয়োজন হয় নাই, তিনি কাহারও অভাব অনুভব করেন নাই। এইটুকু বুঝাইবার জন্য কবি ভ্রমরের সুখের দিনে সখী প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন নাই। (যেমন ভবভূতি সীতার সুখের দিনে বাসন্তী সখীর ব্যবস্থা করেন নাই, কারণ তখন সমদুঃখসুখা সখীর প্রয়োজন নাই।)

তাহার পর, যখন গোবিন্দলাল রোহিণীকে দেশত্যাগ করিতে অসম্মত দেখিয়া রোহিণীর রূপ ভুলিবার জন্য জমীদারী-পরিদর্শনে গেলেন, তখন বিরহিণী ভ্রমর একাকিনী; এই প্রথম বিরহেও তাঁহার সমবেদনাময়ী সখী, ননদ বা ভগিনীর উল্লেখ নাই (বরং 'ননদের সঙ্গে কোন্দল' করার কথাই আছে); কেন না তখনও তাঁহার স্বামীর উপর ষোলআনা বিশ্বাস। [১ম খণ্ড, ১৯শ পরিচ্ছেদ।] তাহার পর, যখন রোহিণীঘটিত কলঙ্ক-কথা মিথ্যা হইলেও ক্ষীরি চাকরাণীর প্রসাদাৎ গ্রামময় রাষ্ট্র হইল, তখনও

তাঁহার সখী, ননদ ও ভগিনীর উল্লেখ নাই। ক্ষীরি চাকরাণী তাঁহার প্রতি সমবেদনাময়ী নহে; 'বিনোদিনী, সুরধুনী, রামী, বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী প্রভৃতি অনেকে, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনি তিনে, দুঃখিনী বিরহ-কাতরা বালিকাকে জানাইল যে, "ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে";' ইহারা ভ্রমরের দুঃখে দুঃখবোধ করে নাই, ঈর্ষ্যাপরিতৃপ্তিজনিত সুখবোধ করিয়াছে। তখনও ভ্রমর স্বামীর উপর বিশ্বাস হারান নাই, তিনি মনে মনে 'সন্দেহভঞ্জন' 'প্রাণাধিক' স্বামীকেই স্মরণ করিলেন; হৃদয়ভার লঘু করিবার জন্য, স্বামীর উপর সন্দেহের কথা কোন আত্মীয়ার কর্ণগোচর করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং এখনও পর্য্যন্ত কবি তাঁহার সখী, ননদ, বা ভগিনীর সমবেদনার ব্যবস্থা করিলেন না। [১ম খণ্ড ২১শ পরিচ্ছেদ।]

তাহার পর, যখন রোহিনীর ব্যবহারে স্বামীর উপর সন্দেহ দৃঢ়তর হইল, তখন তিনি স্বামীকে নির্ম্মম পত্র লিখিলেন এবং স্বামী গৃহে ফিরিবেন সংবাদ পাইয়া দগ্ধপ্রাণ মাএর কোলে জুড়াইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য মাকে পত্র লিখিলেন, কিন্তু মা-ভগিনীর কাছে আসল কথা ভাঙ্গিলেন না। এ লজ্জার কথা, স্বামীর এ কলঙ্কের কথা, পতিপ্রাণা সতী কিরূপে তাঁহাদিগের কাছে প্রকাশ করিবেন? তজ্জন্য, তাঁহার সুখের দিনের অবসান হইলেও তখনও সমবেদনাময়ী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আবির্ভাব হয় নাই। [১ম খণ্ড ২৪শ পরিচ্ছেদ।] তাহার পর, যখন স্বামী ও শাশুড়ী তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন, উভয়েই তাঁহার কাতরক্রন্দন উপেক্ষা করিলেন, গোবিন্দলাল সরলা মুগ্ধাকে 'তোমাকে ত্যাগ করিব' এই নিষ্ঠুর বাক্যবাণে বিদ্ধ করিলেন, শাশুড়ী—'তোমার বড় ননদ রহিল' শুধু এই আশ্বাসটুকু দিলেন, তখনও ননদ বা ভগিনীর সমবেদনার কথা নাই। ভ্রমর এইরূপে প্রত্যাখ্যাতা পরিত্যক্তা হইয়া তাঁহার মৃতপুত্রের

জন্য কাঁদিলেন। [১ম খণ্ড ৩১শ পরিচ্ছেদ।] এই মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে প্রথম খণ্ডের শেষ। তাঁহার দুঃখের নিশার আরম্ভে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই।

এই দ্বিতীয়বার বিরহকালে ভ্রমর ননন্দার শরণ লইয়া শ্বাশুড়ীর নিকট হইতে স্বামীর সংবাদ আনাইতেন, ক্রমে 'আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন।' [২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।] কখন পিত্রালয়ে কখন শ্বশুরালয়ে থাকেন, কোথাও স্বস্তি নাই। এই অবস্থায় তাঁহার ননদের সামান্য উল্লেখের পরে পিতার স্নেহের প্রথম উল্লেখ; পিতা মাধবীনাথ কিরূপে ভ্রমরের দুঃখ ঘুচাইবার, কণ্টক দূর করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্টক-দূরীকরণে কৃতকার্য্য হইয়াও (গোবিন্দলাল রোহিণীকে খুন করাতে) ভ্রমরের নূতন বিপদ্, নূতন দুশ্চিন্তা ও মনঃকষ্ট ঘটাইলেন, পরবর্ত্তী নয়টি পরিচ্ছেদে তাহার বিবরণ আছে। ভ্রমরের কণ্টক উদ্ধার করিতে যে ভাবে চেষ্টা করার প্রয়োজন, তাহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষের কার্য্য, কোমলহৃদয়া নারীর কার্য্য নহে, সুতরাং এ ব্যাপারে স্নেহময় পিতার অবতারণা করিতে হইয়াছে, স্নেহময়ী ভগিনী দ্বারা এ দুরূহ কার্য্য সিদ্ধ হইত না।

এই সব ঘটনার পরে ভ্রমরের দারুণ মনঃকষ্ট ও দুশ্চিন্তার সময়ে, ঘোরান্ধকারা দুঃখ-যামিনীতে তাঁহার স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী শুশ্রূষাকারিণী সান্ত্বনাদায়িনী জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনীর প্রথম আবির্ভাব। ইহা সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী। 'উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়া ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে'। 'মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যা ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট

বলিয়াছিল।' [২য় খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।] ভগিনীর দ্বারা এই নিদারুণ সংবাদ দেওয়া গ্রন্থকারের সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, মাতাপিতার অপেক্ষা ভগিনীর মুখ দিয়া এরূপ সংবাদ শোনা মন্দের ভাল। কেন না তাঁহার সহিত এ বিষয়ে অসঙ্কোচে আলোচনা করা যায়। তাহাতে হৃদয় কতকটা শান্ত হয়। বস্তুতঃ ইহার পরেই দুই ভগিনীর ঐরূপ আলোচনা বিবৃত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে দুই ভগিনীর সখিত্বের প্রথম দৃশ্য প্রদর্শিত। প্রবন্ধবিস্তৃতিভয়ে সমগ্র কথোপকথন উদ্ধৃত করিলাম না। শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু দিলাম।

'যামিনী। বল যদি, না হয়, আমরা কেহ গিয়া থাকিব—তথাপি তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদগাঁয়ে যাইব। মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।"

যামিনী। কি বিপদ ভ্রমর?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তিনি আসেন?"

যামিনী। সে আবার বিপদ কি ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে আহ্লাদের কথা আর কি আছে?

ভ্রমর। আহ্লাদ দিদি! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে?

ভ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমর মানসচক্ষে ধূমময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে, তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।'

[২য় খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।]

এক্ষেত্রে একটি রহস্য প্রণিধানযোগ্য। জ্যেষ্ঠা ভগিনী সমবেদনাময়ী সান্ত্বনাদায়িনী, কিন্তু ভ্রমর তাঁহার কাছেও স্বামীর উপর অশ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সূর্য্যমুখী যেরূপ অকপটে স্বামীর ভগিনীর কাছে স্বামীর আচরণের কথা বলিতে পারিয়াছিলেন, ভ্রমর সেরূপ অকপটে নিজের ভগিনীর কাছে স্বামীর চরিত্র আলোচনা করিতে পারিলেন না। স্বামিকর্ত্তৃক এত অপমান ও দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিয়াও যে অভিমানিনী সকল কথা ভগিনীর নিকট খুলিয়া বলিতে পারিলেন না, ইহা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশিষ্টতা।

এই বিশিষ্টতার জন্যই, গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়া ভ্রমরের পিতার তদ্বিরে খালাস পাইয়া আবার গা-ঢাকা দিলে, স্বামিস্ত্রীতে যে পত্রব্যবহার হইল, তাহা যামিনীর অজ্ঞাতে। অভিমানিনী ভ্রমর এসব কথা ভগিনীকে জানাইতে নারাজ। (আর সে সময়ে ভ্রমর শ্বশুরালয়ে, সুতরাং তাঁহার ভগিনীর এ সব কথা জানিবার সম্ভাবনাও নাই।) [২য় খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ।]

তাহার পর, ভ্রমরের দীর্ঘ দুঃখনিশার শেষ যামে আবার আমরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনীর দেখা পাই। দুর্ভাগিনী ভগ্নহৃদয়া সাংঘাতিক-পীড়াগ্রস্তা শয্যাশায়িনী ভ্রমরের 'যখন দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল', তখন যামিনী হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ভগিনীদ্বয়ের কথোপকথন বড়ই মর্ম্মান্তিক।

'ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন, "আর ঔষধ খাওয়া হইবে না। দিদি—সম্মুখে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি। দেখিস্ দিদি—যেন ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাত্রি পলাইয়া যায় না। যদি দেখিস্ যে পূর্ণিমার রাত্রি পার হই—তবে আমায় একটা অন্তরটিপনি দিতে ভুলিস না।

রোগে হউক, অন্তরটিপনীতে হউক,—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাত্রে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি।”

যামিনী কাঁদিল।···ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণায়ও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন,--“আজ শেষ দিন।”

যামিনী কাঁদিল। ভ্রমর বলিল—“দিদি—আজ শেষদিন—আমার কিছু ভিক্ষা আছে—কথা রাখিও।”

যামিনী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না।

ভ্রমর বলিল, “আমার এক ভিক্ষা, আজি কাঁদিও না।—আমি মরিলে পর কাঁদিও—আমি বারণ করিতে আসিব না—কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়েকটা কথা কইতে পারি, নির্ব্বিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।”

যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল—কিন্তু অবরুদ্ধ বাষ্পে আর কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর বলিতে লাগিল—“আর একটি ভিক্ষা—তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব—কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।”

যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবে?

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি রাত্রি কি জ্যোৎস্না?”

যামিনী জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল “দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।”

ভ্রমর। তবে জানেলাগুলি সব খুলিয়া দাও—আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি ঐ জানেলার নীচে যে ফুলবাগান উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না?

সেই জানেলায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। আজি সাতবৎসর ভ্রমর সে জানেলার দিকে যান নাই—সে জানেলা খোলেন নাই।

যামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া বলিল, "কই এখানে ত ফুলবাগান নাই—এখানে কেবল খড়বন—আর দুই একটা মরা মরা গাছ আছে—তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।"

ভ্রমর বলিল, "সাত বৎসর হইল ওখানে ফুলবাগান ছিল। বেমেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই।"

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর ভ্রমর বলিলেন "যেখান হইতে পার দিদি আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না আজি আবার আমার ফুলশয্যা ?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাসদাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিল "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দেও—আজ আমার ফুলশয্যা।"

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, "কাঁদিতেছ কেন দিদি ?"

ভ্রমর বলিল, "দিদি একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন যোড় হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, একদিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিন—মরিবার দিনে, দিদি যদি একবার দেখিতে পাইতাম। একদিনে দিদি সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম!"

যামিনী বলিল "দেখিবে ?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—বলিল—"কার কথা বলিতেছ ?"

যামিনী স্থিরভাবে বলিল "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা তোমার পীড়ার সংবাদ দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌঁছিয়াছেন। তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, "একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখা!"

এই বিষাদময় দৃশ্যে দুই ভগিনীর প্রীতিসম্পর্কের চিত্র অন্ধকারমধ্যে বিজলীর ন্যায় কি ভীষণোজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়াছে!

ইহার পর যামিনীর আর দেখা পাইব না। (তবে দুইবার গোবিন্দলাল-ভ্রমরের সাধের পুষ্পোদ্যানের প্রসঙ্গে তাঁহার নামোল্লেখ আছে।) ভ্রমরের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই স্নেহময়ী ভগিনীর কার্য্য শেষ হইয়াছে।

স্বামী নিষ্করুণ, স্নেহপরায়ণ জ্যেঠশ্বশুর স্বর্গগত, শাশুড়ী আত্মপরায়ণা ও বধূর প্রীতি বীতরাগা, ননদ থাকিয়াও নাই, সখীর সমাগম নাই; এই মরুভূমিতে পিতৃস্নেহ ও ভগিনীস্নেহই অভাগিনী ভ্রমরকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যতদূর মনে পড়ে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দুই ভগিনীর ভালবাসার চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র দুই ভগিনীর ভালবাসার যে দুইটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রাচীন সাহিত্য হইতে আদর্শ পান নাই। এক্ষণে দেখা

যাউক, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বা ঈষৎ পূর্ব্ববর্ত্তী আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ চিত্র আছে কি না।

'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকে কুলীনের ঘরের চিত্র আছে। কুলীনের ঘরে কুমারী বা সধবা কন্যাদিগের বহুদিন ধরিয়া অবিচ্ছেদে একত্র থাকিবার কথা, অতএব তাঁহাদিগের সদ্ভাব-সম্প্রিতির যথেষ্ট অবসর আছে। এই নাটকে চারিটি 'কুলীন-কুমারী অনূঢ়া অবলা' 'জাহ্নবী শাম্ভবী আর কামিনী কিশোরী' পিতৃ-গৃহবাসিনী—কেহ বালিকা, কেহ নবযুবতী, কেহ বা বিগতযৌবনা। কিন্তু কৈ, তাহাদের সদ্ভাব-সম্প্রীতির বিশেষ কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। ষষ্ঠ অঙ্কে কয়েক ভগিনীর কথাবার্ত্তায় যেটুকু পাওয়া যায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সাহিত্যের কথা তুলিলে স্বতঃই তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ৺দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলির কথা মনে পড়ে। 'জামাই-বারিকে' ঘর-জামাই রাখার ব্যাপার বর্ণিত; এই নাটকে বিবাহিতা কন্যা সকলেই পিতৃগৃহবাসিনী, সুতরাং ইহাতে ভগিনীগণের সদ্ভাব-সম্প্রীতির চিত্র অঙ্কিত করিবার সুন্দর সুযোগ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নাটকের একটি দৃশ্যে বরং ননদ-ভাজকে এক নিমিষের জন্য পরস্পরের সংস্পর্শে আনা হইয়াছে, কিন্তু ভগিনীদিগকে কোথাও একত্র দেখা যায় না। ধনি-কন্যারা প্রত্যেকে যেমন এক একটি ঘর পাইয়াছিলেন, তেমনই বোধ হয় সেই খাসকামরায়ই তাঁহাদিগের বসবাস ছিল, ভগিনীদিগের সহিত বড় একটা মিশিতেন না। কামিনী তিনবার তিন ভগিনীর কথা তুলিয়াছেন; একবার 'সতী-লক্ষ্মী মেজদিদি'র পতির অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতিনী হওয়ার প্রসঙ্গে 'মেজদিদি'র প্রতি কামিনীর প্রীতি-সমবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে [১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক]—এইটুকুই ভগিনী-প্রীতির বিন্দুমাত্র নিদর্শন; একবার 'সেজদিদি'র স্বামিসুখের কথা আছে

[১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক] ; আর একবার 'নদিদি'র স্বামীকে লাথি মারার কথা [৩য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক]। বস্! কামিনীও 'ন-দিদি'র নজির অনুসরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, ইহাকে যদি ভগিনীতে ভগিনীতে সমপ্রাণতা বলেন, বলিতে পারেন!

'লীলাবতীতে' নায়িকা যৌবনস্থা হইয়াও কুমারী। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভাগিনী তারা ওরফে অহল্যা, বিবাহিতা, পতিগৃহবাসিনী। কিন্তু তাহাদিগের ভগিনী-সম্পর্ক নাটকের শেষ দৃশ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সুতরাং এই নাটকেও ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার চিহ্ন নাই।

পক্ষান্তরে, 'বিয়েপাগলা বুড়ো'য় দুইটি বিধবা ভগিনী পিত্রালয়-বাসিনী ; (তাঁহাদিগের সধবা ভগিনীটি স্বামিগৃহবাসিনী, তাঁহার এক আধবার উল্লেখ আছে।) এই দুইটি বিধবা ভগিনী রামমণি ও গৌরমণিকে দুইটি দৃশ্যে [১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক ; ২য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক] একত্র দেখা যায় ; ইহার প্রথম দৃশ্যে উভয়-ভগিনীর স্নেহ-সমবেদনার একটি সুন্দর চিত্র আছে। এটি দুঃখের চিত্র।

'নবীন-তপস্বিনী'তে মল্লিকা-মালতী রামমণি-গৌরমণির ন্যায় সহোদরা নহেন, মামাত-পিসতুত ভগিনী। (৭) ইঁহারা পিতৃগৃহবাসিনী নহেন, কিন্তু এক নগরে পতিগৃহ বলিয়া সর্ব্বদা দেখাশুনা হইত। ইঁহাদিগের দুজনে গলায় গলায় ভাব, ইঁহারা আমোদে প্রমোদে একপ্রাণ, একাভিসান্ধ। ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে এবং অন্য বহু স্থলে উভয়ের সখা-প্রীতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। এটি সুখের চিত্র।

---

(৭) জলধরের লাম্পট্যলীলা ও মল্লিকা-মালতী-কর্ত্তৃক তাহার শাস্তিবিধান শেক্স্পীয়ারের Merry Wives of Windsorএ Falstaffএর বৃত্তান্তের অনুকরণে লিখিত। কিন্তু শেক্স্পীয়ারের নাটকে Mrs Page ও Mrs Ford ভগিনী নহেন, প্রতিবেশীনী মাত্র।

তাহা হইলে দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয় বন্ধুই দুই ভগিনীর সদ্ভাব-সম্প্রীতির দুইটি করিয়া চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং উভয় বন্ধুরই একটি সুখের চিত্র, অপরটি দুঃখের চিত্র। তবে দীনবন্ধুর নাটকদ্বয়ে অপ্রধানা পাত্রীর স্নেহময়ী ভগিনীর চিত্র আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাদ্বয়ে নায়িকার স্নেহময়ী ভগিনীর চিত্র আছে।

৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটকে সরলা ও তরলা দুই ভগিনীর ভালবাসার চিত্রও অতি সুন্দর। সরলা ছদ্মবেশীনী 'মেজ-দিদি'কে চিনিতে না পারিয়াও তাঁহার প্রতি স্নেহবতী। পরে পরিচয় পাইলে ত উভয়ে একাত্মা হইলেন। তরলাও ছোট ভগিনীর সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়া কৃতার্থা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ'এ ননদ-ভাজের সদ্ভাবের চিত্র আছে, কিন্তু শ্যামা-বামা দুই ভগিনীর সদ্ভাবের চিত্র নাই। (৮) বামার মৃত্যু হইলে শ্যামা একবার 'বামা, কোথায় গেলি রে' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল, এই মাত্র ভগিনীস্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়!

৺রমেশচন্দ্র দত্তের শেষবয়সে রচিত 'সংসারে' বিন্দু ও সুধা দুই সহোদরা ভগিনীর এবং বিন্দু ও উমাতারা দুই জ্ঞাতি-ভগিনীর প্রীতি-সম্পর্কের সুন্দর পূর্ণায়তন চিত্র আছে। বিশেষতঃ উমাতারার দুঃখের দিনে বিন্দুর সেবা ও সমবেদনা, ভ্রমরের দুঃখের দিনে যামিনীর সেবা ও সমবেদনার মতই আন্তরিক ভালবাসার নিদর্শন। তবে উমাতারা ভ্রমরের ন্যায় গ্রন্থের নায়িকা নহেন, অপ্রধানা পাত্রী। যাহা হউক, রমেশচন্দ্রের এই আখ্যায়িকা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরে প্রকাশিত।

(৮) 'কপালকুণ্ডলা'য় শ্যামা কনিষ্ঠা ভগিনী, এখানে শ্যামা জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তবে উভয় শ্যামাই কুলীন-পত্নী, সুতরাং পিতৃগৃহবাসিনী। 'কপালকুণ্ডলা'য় দুই ভগিনীর সদ্ভাব-অসদ্ভাব কোন কথাই নাই। এখানে বরং একটু অসদ্ভাবের কথা আছে।

সুতরাং এক্ষেত্রে যদি কেহ কাহারও অনুসরণ করিয়া থাকেন, তবে রমেশচন্দ্রই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছেন।

বিন্দু ও সুধার প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতে চাহি। সুধার বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে বিন্দুর সম্মতিদান হিন্দুর চক্ষে অস্বাভাবিক ঠেকে বটে; সে বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারের বিবেচনার দোষ দিতে পারি। কিন্তু ভগিনীপতি হেমচন্দ্র যে বিধবা শ্যালিকা সুধাকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া আধুনিক কোন কোন আখ্যায়িকা ও ছোটগল্পের নায়কের ন্যায় তাঁহার সহিত প্রেমে পড়েন নাই, এই সুবিবেচনার জন্য গ্রন্থকার শ্রদ্ধার পাত্র, সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে' চারিটি ভগিনীর (এক জন বিধবা, একজন বিবাহিতা ও দুই জন অনূঢ়া যুবতী কুলীনকন্যা) সখিত্ব ও পরস্পরের প্রতি স্নেহ অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। অবশ্য এই পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক পরে রচিত। (৯)

এই অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্র দুই ভগিনীর ভালবাসার চিত্র অঙ্কন করিয়া আমাদিগের সাহিত্যে একটি নূতন ও সুন্দর আদর্শ প্রচার করিয়াছেন এবং এ জন্য তিনি (অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ ৺দীনবন্ধু মিত্রের সহিত একযোগে) বাঙ্গালীজাতির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

ইংরেজী সাহিত্য।

প্রবন্ধের আরম্ভে বলিয়াছি, বিলাতী সমাজে দুই ভগিনীর যৌবনে একত্রাবস্থান দুর্ঘট নহে, সুতরাং বিলাতী সমাজে ও বিলাতী সাহিত্যে

(৯) এই পুস্তকে শ্যালিকা, বিশেষতঃ বিধবা শ্যালিকার সহিত ভগিনীপতির রঙ্গরস যথেষ্ট আছে, অথচ অবৈধ প্রণয়ের কুৎসিত চিত্র নাই।

দুই ভগিনীর সদ্ভাব-সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক্ষণে, বিলাতী সাহিত্যে এই শ্রেণীর চিত্র কি ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

এই প্রসঙ্গে বিলাতের শ্রেষ্ঠ কবি শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকাবলি স্বতঃই মনে আসে। সেই অমর কবির তূলিকায় অকৃত্রিম স্নেহশালিনী ভগিনী-দিগের চিত্র কি বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, জানিতে কৌতূহল হয়। নিজের অবলম্বিত ব্যবসায়ে শেক্‌স্‌পীয়ারের কাব্যের আলোচনা সর্ব্বদাই করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে পাঠকসমাজকে ছাত্র-সম্প্রদায়-ভ্রমে লম্বা লেক্‌চার না দিয়া যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিষয়টির আলোচনা করিব। জানি না, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাকেও পাঠকবর্গ লেখকের জাত-ব্যবসার কথা (talking shop) বলিয়া উপহাস করিবেন কি না।

(১) সকলেই জানেন, বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক (Tragedy) King Learএ তিন সহোদরার বৃত্তান্ত আছে। জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা দুঃশীলা, কনিষ্ঠা সুশীলা। সুশীলা কনিষ্ঠা ভগিনী হয়ত জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমার প্রতি একেবারে প্রীতিশূন্যা ছিলেন না, কিন্তু পিতৃসম্পত্তি-বিভাগকালে এবং পিতৃ-ভবন হইতে বিদায়কালে পিতার অবিমৃষ্যকারিতা ও ভগিনীদিগের রাজ্যলোভ, উচ্চাভিলাষ, কপটাচার প্রভৃতি দেখিয়া তিনি সেই বিষকুম্ভ-পয়োমুখ ভগিনীদ্বয়কে দুই চারিটি স্পষ্ট কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা প্রথমে পিতাকে ভুলাইয়া রাজ্যলাভ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় এবং পরে পিতার উপর অত্যাচার করিবার উদ্দেশ্যে একযোগে এক-পরামর্শ হইয়া কার্য্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা প্রগাঢ় প্রীতিজনিত হৃদ্যতা নহে, স্বার্থসাধনের উপায় মাত্র। পরে ইহারা একই উপপতির প্রতি গুপ্ত প্রণয়বশতঃ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়াছিল এবং জ্যেষ্ঠা

বিদ্বেষবশে মধ্যমার প্রাণনাশ করিয়াছিল। আবার জ্যেষ্ঠা উপপতির সহিত পরামর্শ করিয়া কনিষ্ঠারও গুপ্তহত্যার আদেশ দিয়াছিল। ফলতঃ এই নাটকে তিন সহোদরার বিরোধের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। তবে ইহা সাধারণ গৃহস্থঘরের কথা নহে, রাজারাজড়ার ঘরের কথা। 'পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,' তা ভগিনী ত দূরের কথা।

(২) মিলনান্ত নাটক (Comedy) Taming of the Shrewতে দুইটি সহোদরা আছেন। (বোধ হয় এই নাটকখানি সাধারণ পাঠকের তেমন সুপরিচিত নহে।) এখানেও জ্যেষ্ঠা (Katherine the Shrew) দুঃশীলা, কনিষ্ঠা সুশীলা। উগ্রচণ্ডা জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার প্রতি প্রীতিশূন্যা, পরন্তু তাহার উপর শারীরিক অত্যাচার পর্য্যন্ত করে! শান্তপ্রকৃতি কনিষ্ঠা কিন্তু এরূপ দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠাকে ভালবাসে ও মান্য করে। উভয়েই গ্রন্থারম্ভে অবিবাহিতা। একস্থলে কথাবার্ত্তা হইতে বুঝা যায়, উভয়ে এক প্রণয়ভাজনের প্রতি অনুরাগিণী নহে, সুতরাং তাহারা পরস্পরের প্রতিযোগিনী হইয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবতী নহে। এ বিষয়ে *King Lear*এ বর্ণিত জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা ভগিনী এবং আমাদের সাহিত্যে বর্ণিত কিরণময়ী-হিরণ্ময়ী প্রভৃতি ভগিনীদ্বয়ের সহিত তাহাদিগের সম্পূর্ণ প্রভেদ। উভয় ভগিনীর বিবাহিত অবস্থার যেটুকু চিত্র আছে, তাহাতেও তাহাদের সদ্ভাব-সম্প্রীতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব *King Lear*এর চিত্রের মত এ চিত্রেও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য নাই।

(৩) মিলনান্ত নাটক *Comedy of Errors*এও দুই সহোদরার প্রসঙ্গ আছে। (বোধ হয়, এই নাটকখানিও সাধারণ পাঠকের তেমন সুপরিচিত নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আখ্যায়িকাকারে অনুবাদ 'ভ্রান্তিবিলাসে'র মারফত ইহা বহু বাঙ্গালী পাঠকের পরিচিত।) জ্যেষ্ঠা বিবাহিতা স্বামিগৃহবাসিনী, কনিষ্ঠা অনূঢ়া, যুবতী, ভগিনী-ভগিনীপতির

গৃহেই থাকেন। এখানে দুই সহোদরার প্রীতিসম্পর্ক উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। প্রথমেই (২য় অঙ্ক ১ম দৃশ্যে) যখন আমরা দুই ভগিনীকে দেখি, তখন জ্যেষ্ঠা Adriana কনিষ্ঠা Lucianaর নিকট স্বামীর অবহেলার জন্য আক্ষেপ করিতেছেন, স্বামীর প্রণয় হারাইয়াছেন এই সন্দেহে দুঃখ ও অভিমান প্রকাশ করিতেছেন; তিনি ভ্রমরের ন্যায় ভগিনীর নিকট কোন কথা চাপিতেছেন না, নিঃসঙ্কোচে সকল কথা ভগিনীর কর্ণগোচর করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিতেছেন। ভগিনীও তাঁহার দুঃখে সমবেদনা জানাইতেছেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সাধারণ স্ত্রীলোকের মত তাহাতে রসান দিতেছেন না, তাঁহাকে স্বামীর বিরুদ্ধে আরও উত্তেজিত করিতেছেন না; বরং ইন্দিরা স্বামীর রীতি চরিত্র দেখিয়া স্বামীর নিন্দা করিলে সুভাষিণী যেমন পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নহে, 'আমরা দাসী না ত কি ?' (১৩শ পরিচ্ছেদ) এই তত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন, কনিষ্ঠা ভগিনীও ঠিক সেই ভাবে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নহে, কি ইতর প্রাণী কি মনুষ্য, সর্ব্বত্র পুরুষ স্বাধীন, নারী পুরুষের অধীন, এই তত্ত্ব শিখাইয়া জ্যেষ্ঠাকে ঈর্ষ্যা ও অভিমান ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন; নিজে বিবাহিতা না হইয়াও তিনি পতির দুর্ব্যবহারে পত্নীকে যেরূপ 'ক্ষেমা-ঘেন্না' করিবার পরামর্শ দিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি সুশীলা ও শান্তপ্রকৃতি এবং আশা করা যায় যে তিনি বিবাহিত জীবনে আদর্শপত্নী হইবেন। তাঁহার বিবাহ-বিষয়ে জ্যেষ্ঠা ভগিনী এই প্রসঙ্গে একটু কৌতুক করিতেও ছাড়েন নাই। এই একটি দৃশ্যেই দুই ভগিনীর অন্যোন্যানুরাগ এবং কনিষ্ঠা ভগিনীর সমবেদনা ও হৃদ্যতা সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী দৃশ্যে (২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্যে) যখন স্বামীর যমজ ভ্রাতাকে স্বামিভ্রমে Adriana অবহেলার জন্য ভর্ৎসনা করিতেছেন, তখন কনিষ্ঠা

Lucianaও সেই ভৎর্সনায় যোগ দিলেন। ইহাও তাঁহার জ্যেষ্ঠার সহিত সমপ্রাণতার নিদর্শন। (১০) ইহার পরে যখন জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অনুপস্থিতিতে নকল ভগিনীপতির সহিত কনিষ্ঠার সাক্ষাৎ হয়, তখনও তিনি দিদির প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে অনুযোগ করিতে ছাড়িলেন না, এবং এসম্বন্ধে বুদ্ধিমতীর মত সৎপরামর্শ দিলেন। (৩য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য।) এই অবসরে নকল ভগিনীপতি তাঁহার প্রতি প্রণয়প্রকাশ করিলে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং বেশী বাড়াবাড়ি দেখিয়া দিদিকে ডাকিতে গেলেন। পরে একটি দৃশ্যে দেখা যায়, (৪র্থ অঙ্ক ২য় দৃশ্যে) তিনি সত্যসত্যই দিদিকে এই কথা জানাইলেন; দিদি যেমন নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ নিঃসঙ্কোচে দিদির নিকট দিদির স্বামীর কীর্ত্তিকথা প্রকাশ করিলেন। (বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে উভয় ভগিনীই ভ্রান্ত; এই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জ্যেষ্ঠার স্বামী নহেন, স্বামীর যমজ ভ্রাতা)। (১১)

---

(১০) দুই ভগিনীর কাণ্ড দেখিয়া এই ব্যক্তি বারংবার বলিয়াছে, এটা যাদুকর-যাদুকরীর দেশ এবং ইহারা ডাকিনী (witches)। ইহা ইন্দিরার কামরূপের ডাকিনী বা বিদ্যাধরী সাজার এবং তাঁহার স্বামীর ভ্রমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

(১১) পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের আধুনিক সাহিত্যে আখ্যায়িকায় ও ছোটগল্পে শ্যালিকা-প্রেমের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এই নাটকের নকল ভগিনীপতির উক্তি—

Your weeping sister is no wife of mine,
Far more, far more, to you do I decline.

* * * *

She, that doth call me husband, even my soul
Doth for a wife abhor ; but her fair sister
Hath almost made me traitor to myself (III. ii)

ইহার পরেও দুইটি দৃশ্যে দুই ভগিনীকে একত্র দেখা যায়। (নাটকের প্রায় সর্ব্বত্র এই কৌশল দৃষ্ট হয়, যেখানেই জ্যেষ্ঠা উপস্থিত, সেখানেই তাঁহার পার্শ্বে সমবেদনাময়ী কনিষ্ঠা উপস্থিত।) মাতাজী (Lady abbess যখন পত্নীর দুর্ব্যবহারেই স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া পত্নীকে তিরস্কার করিলেন, তখন কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার পক্ষ লইয়া সে কথা অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে জ্যেষ্ঠা কখনই স্বামীর প্রতি কঠোরতা দেখান নাই; জ্যেষ্ঠা নিজে এইরূপ একরার করিলেও কনিষ্ঠা সে কথাকে আমল দিলেন না। ইহাও তাঁহার ভগিনীর প্রতি ভালবাসার সুন্দর নিদর্শন। মাতাজী স্বামীকে আটক রাখিলে তিনিই ভগিনীকে স্বামিদখলের জন্য রাজার নিকট নালিশ করিতে পরামর্শ দিলেন এবং নালিশ রুজু হইলে উৎসাহের সহিত দিদির পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। (৫ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য।) এ সমস্তই তাঁহার ভগিনীর সহিত সমপ্রাণতার পরিচায়ক।

ফলতঃ, এই নাটকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মনোবেদনায় সহানুভূতি, সান্ত্বনা, সৎপরামর্শ, সাহায্য, সাহচর্য্য প্রভৃতির সমবায়ে কনিষ্ঠা ভগিনীর চরিত্র-চিত্র বড়ই উজ্জ্বল বড়ই সুন্দর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, ভগিনীর সখিত্ব

—ঠিক আমাদের ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার শ্যালিকা-প্রেমিক ভগিনীপতির মনোভাবের অনুরূপ, তবে পরবর্ত্তী দুই ছত্রের সংযম এই শ্রেণীর আখ্যায়িকায় দেখা যায় না।

But lest myself be guilty to self-wrong,
I'll stop mine ears against the mermaid's song.

বলা বাহুল্য, শেক্‌স্‌পীয়ার এক্ষেত্রে বাস্তবিক শ্যালিকাপ্রেমের জয়গান করেন নাই। উদ্ধৃত উক্তির পাত্রী প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃবধূর ভগিনী, অতএব ৺দীনবন্ধু মিত্রের ভাষায় 'করণীয় ঘর'। এই মিলনান্ত নাটকের শেষে, উক্তিকারী সত্যসত্যই তাঁহাকে বিবাহ করিয়া যমজ ভ্রাতার ভায়রাভাই হইলেন, ইহার আভাস পাওয়া যায়।

অতি মধুরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই নাটকে যমজভ্রাতাদিগের ব্যক্তিত্ব লইয়া নানালোকের ভ্রমবশতঃ যে সমস্ত কৌতুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, সেই দিকেই সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; সুতরাং ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার এই সুন্দর সুশোভন চিত্র সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু আখ্যায়িকায়ও নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির প্রেমের বর্ণনায় সাধারণ পাঠক এত বিভোর হন যে ননদ-ভাজ, বা দুই ভগিনীর ভালবাসার চিত্রগুলি লক্ষ্য করেন না।

শেক্‌স্‌পীয়ারের আরও দুইখানি মিলনান্ত নাটকে—*As You Like It* ও *Much Ado About Nothing*—দুই ভগিনীর ভালবাসার সুন্দর বিবরণ আছে, তবে তাঁহারা সহোদরা নহেন, Cousin-সম্পর্কিতা। কিন্তু Cousin হইলেও, তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রীতি সহোদরার প্রীতি অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। (শেক্‌স্‌পীয়ারের ভাষায়—'Whose loves are dearer than the natural bonds of sisters' *As You Like It*, I. ii.)। দুইটি চিত্রই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। (এ দুইখানি নাটক *King Lear* এর ন্যায় সাধারণ পাঠকের সুপরিচিত না হইলেও পূর্ব্বকথিত দুইখানি মিলনান্ত নাটক অপেক্ষা সুপরিচিত; বিশেষতঃ *As You Like It* কবির একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক সুতরাং সুপরিচিত হইবার কথা।)

(৪) *Much Ado*তে (Hero) হীরো ধীরা, অল্পভাষিণী; (Beatrice) বীয়াট্রিস প্রগল্‌ভা, বহুভাষিণী, রঙ্গব্যঙ্গ্যে সুদক্ষা; কিন্তু দুই ভগিনীর প্রকৃতির এইরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধন সুদৃঢ় এবং উভয়ের হৃদয় পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ। তাহারা পরস্পরের নিত্যসঙ্গিনী, প্রায় সর্ব্বত্র উভয়কে একত্র দেখা যায়। বীয়াট্রিস্ হীরোকে (২য় অঙ্ক ১ম দৃশ্যে) হাসিতে হাসিতে প্রণয়ীর প্রতি ব্যবহার

সম্বন্ধে যে পরামর্শ দিলেন, (১২) তাহাতে তাঁহার রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ভগিনীস্নেহের আভাস পাওয়া যায়। ঐ দৃশ্যেই উচ্চবংশজ গুণবান্ বর হীরোর নিকট বিবাহ-প্রস্তাব করিলে, বীয়াট্রিস্ হীরোকে যে মধুমাখা কথাগুলি বলিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় তিনি ভগিনীর ভাবী স্বামি-সৌভাগ্যের জন্য কত আনন্দিতা, ভগিনীর কত শুভাকাঙ্ক্ষিণী। আবার যখন ঐ দৃশ্যেই বীয়াট্রিসকে তাঁহার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বরের সহিত প্রেমের ফাঁদে ফেলিবার সলা-পরামর্শ হইল, তখন অল্পভাষিণী হীরো সর্ব্বান্তঃকরণে সেই শুভকার্য্যসিদ্ধির জন্য নিজ সামর্থ্যমত চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুতা হইলেন। ইহাতে বুঝা য়ায়, ভগিনী যেমন তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, তিনিও সেইরূপ ভগিনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। উল্লিখিত কৌশল সফল হইলে তিনি ভগিনীর কোথায় ব্যথা জানিয়া অন্যান্য রঙ্গপ্রিয়া পাত্রীদিগের ন্যায় তাঁহাকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিলেন না (৩য় অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য।) ইহাতে তাঁহার অকৃত্রিম ভগিনী-প্রীতি ও সমবেদনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরের একটি দৃশ্যে বীয়াট্রিস্ হীরোর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও সমবেদনার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এইটি নাটকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য (৪র্থ অঙ্ক ১ম দৃশ্য)। হীরো ও তাঁহার ভাবী বর ভজনালয়ে পবিত্র উদ্‌বাহ-বন্ধনের জন্য উপস্থিত, আত্মীয়বর্গ সমবেত, এমন সময় বিষম ষড়যন্ত্রের প্রভাবে (১৩) প্রতারিত বর কর্ত্তৃক কন্যা কলঙ্কিনী বলিয়া অবমানিতা, প্রত্যাখ্যাতা, ধিক্কৃতা। তৎক্ষণাৎ বীয়াট্রিসের হাস্যময়ী কৌতুকময়ী মূর্ত্তির একেবারে তিরোভাব হইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার অশ্রুময়ী সমবেদনা-

(১২) Speak, cousin ; or if you cannot, stop his mouth with a kiss, and let not him speak neither.

(১৩) এই ষড়যন্ত্র ৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকে অনুকৃত হইয়াছে।

ময়ী মূৰ্ত্তির আবির্ভাব হইল। (বঙ্কিমচন্দ্রের কমলমণি-সুভাষিণী এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য।) বীয়াট্রিস সর্ব্বাগ্রে ভগ্নহৃদয়া ভগিনীর মূৰ্চ্ছিত অবস্থা দেখিতে পাইলেন, প্রাণনাশের আশঙ্কায় অস্থির হইলেন এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে ও সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর হইলেন। যখন স্নেহময় পিতা পর্য্যন্ত আত্মজার কলঙ্ককথায় বিশ্বাসস্থাপন করিয়া হত-ভাগিনীর মৃত্যুকামনা করিতেছেন, তখনও ভগিনীর নির্দ্দোষিতায়, কলঙ্ক-কাহিনীর অলীকতায় বীয়াট্রিসের অবিচলিত বিশ্বাস। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার ভগিনীর প্রতি প্রীতি-শ্রদ্ধা কত গভীর ও কেমন অকৃত্রিম। তিনি সুযোগ পাইলেই যে ব্যক্তির সহিত কথা-কাটাকাটি করিতেন, এখন সেই ব্যক্তিকে এই দারুণ বিপদে সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করি-লেন, ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় লজ্জায় নারীসুলভ কোমলতা বিস্মৃত হইয়া ভগিনীর পাণিপ্রার্থী বিশ্বাসঘাতকের রক্তদর্শন করিতে চাহিলেন এবং এই কার্য্য সাধন করিলে উল্লিখিত ব্যক্তি (Benedick) যে তাঁহার প্রতি প্রকৃতপক্ষে অনুরাগী ইহা বিশ্বাস করিবেন, এরূপ আভাস দিলেন। এই কার্য্যগুলিও যে তাঁহার গভীর ভগিনীস্নেহের নিদর্শন, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না।

পঞ্চম অঙ্কে এই ব্যাপারের সুখময় পরিণাম ঘটিলে, যখন য়োড়া বিবাহের উদ্‌যোগ চলিতেছিল, এবং বীয়াট্রিসের বিষয়ে যে কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া সকলে রঙ্গ করিতেছিলেন, তখন হীরোও সেই রঙ্গরসে যোগ দিলেন, কেন না তখন তাঁহার হৃদয় নিজের ও ভগিনীর সুখসম্পদে ভরপূর। নাটকে এই সুখের চিত্রে দুই ভগিনীর প্রীতিসম্পর্কের বর্ণনা শেষ হইয়াছে।

এই নাটকেও Benedick-Beatriceএর বাগ্‌যুদ্ধ, তাঁহাদিগকে প্রেমের ফাঁদে ফেলিবার জন্য কৌতুকাবহ কৌশল এবং হীরোর অদৃষ্ট-

বিড়ম্বনা সাধারণ পাঠকের চিত্ত হরণ করে, সুতরাং ভগিনীদ্বয়ের প্রীতি-সম্পর্কের এই সুন্দর চিত্র হয়ত অনেকের চোখে পড়ে না।

(৫) *As You Like It*এ Celia ও Rosalind খুড়তুত-জ্যেঠতুত ভগিনী; সিলিয়ার পিতা রোজালিণ্ডের পিতাকে (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে) রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজ্য দখল করিয়াছেন এবং তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, কিন্তু কন্যার বাল্যসখী ভ্রাতৃকন্যাকে নিজ কন্যার মুখ চাহিয়া নির্ব্বাসিত করেন নাই। (১৪) এই অবস্থায় নাটকের আরম্ভ। রাজবংশে জন্মিলেও তাঁহাদিগের Goneril Reganএর মত রাজ্যলোভ ও বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল না। বিশেষতঃ পিতার প্রকৃতি সিলিয়ার প্রকৃতিতে একেবারেই সংক্রমিত হয় নাই। দুই ভগিনীতে শৈশব হইতে একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র নিদ্রা, একত্র জাগরণ, একত্র পাঠ, একত্র ক্রীড়া (১৫)—সুতরাং উভয়ে প্রগাঢ় প্রণয়। তাঁহারা পরস্পরের সহ-চারিণী ও সহকারিণী, পরস্পরের নর্ম্মসখী ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী। পূর্ব্বকথিত নাটক দুইখানির ন্যায় এখানিতেও প্রায় সর্ব্বত্র যে দৃশ্যে এক ভগিনীকে দেখা যায়, সে দৃশ্যে অপর ভগিনীকেও তাঁহার পার্শ্বে দেখা যায়।

উভয় ভগিনীই রঙ্গপটু, কিন্তু নাটকের আরম্ভে (১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য) রোজালিণ্ড পিতার নির্ব্বাসনে বিষণ্ণা; তাঁহার বিষাদ দূর করিবার জন্য

---

(১৪) For the Duke's daughter, her cousin, so loves her, being ever from their cradle bred together, that she would have followed her exile, or have died to stay behind her—I. i.

(১৫) We still have slept together,
Rose at an instant, learn'd, play'd, eat together ;
And wheresoe'er we went, like Juno's swans,
Still we went coupled, and inseparable—I. iii.

স্নেহময়ী সিলিয়া ভগিনীকে বলিলেন যে ভগিনীর পিতা যদি তাঁহার পিতাকে নির্ব্বাসিত করিতেন, তাহা হইলে তিনি ভগিনীর সাহচর্য্যে পিতার নির্ব্বাসন ভুলিতেন; ইহা তাঁহার আন্তরিক কথা। এই কথা বলিয়া তিনি ভগিনীকে লজ্জা দিলেন, এবং ভগিনীর ভালবাসা তাঁহার ভালবাসার মত প্রগাঢ় নহে বলিয়া অনুযোগ করিলেন। রোজালিণ্ড এই কথায় লজ্জা পাইয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া ভগিনীর সুখে সুখবোধ করিলেন এবং তাঁহার সহিত নর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্বল্প কথোপকথন হইতে দুই ভগিনীর ভালবাসার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল।

এই দৃশ্যেই উভয় ভগিনী একযোগে একজন অপরিচিত যুবককে পরিণামবিষম মল্লযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিলেন, তাহার মঙ্গলকামনা করিলেন, তাহাকে উৎসাহ দিলেন, তাহার জয়ে উৎফুল্ল হইলেন এবং তাহাকে সাধুবাদ করিলেন। পরেও অনেক দৃশ্যে তাঁহারা একযোগে কার্য্য করিয়াছেন। (৩য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক ১ম ও ৩য় দৃশ্য দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে তাঁহাদিগের একাত্মতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তী দৃশ্যে (১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য) সিলিয়া উক্ত যুবকের প্রতি রোজালিণ্ডের পূর্ব্বরাগলক্ষণ দেখিয়া পরিহাস করিতে ছাড়িলেন না, কিন্তু সেই পরিহাসের ভিতরেও তাঁহার সমবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঐ দৃশ্যেই যখন রাজা হঠাৎ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রোজালিণ্ডকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিলেন, তখন সিলিয়া ক্রোধান্ধ পিতার ক্রোধোপশান্তির জন্য যে ঐকান্তিক চেষ্টা করিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার ভগিনীর সহিত স্নেহবন্ধন কত দৃঢ়। পিতাকে এই হঠকারিতার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া তিনি স্নেহপাত্রী ভগিনীর উপর অত্যাচার-অবিচারের জন্য পিতার প্রতি বিরাগবতী হইলেন এবং ভগিনীর

বিপদে বিপদ্‌জ্ঞান করিয়া নিজের পিতার রাজভবন ত্যাগ করিয়া মহারণ্যে ভগিনীর নির্ব্বাসিত পিতার নিকট ভগিনীর সহিত একযোগে পলায়ন করিতে প্রস্তুত হইলেন। ভগিনী-স্নেহের নিকট পিতৃভক্তি পরাজিত হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায়, দুই ভগিনীতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতেছেন এবং পরস্পরের সাহচর্য্যে সুখ বোধ করিতেছেন।

যে মহারণ্যে তাঁহারা আশ্রয় লইয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে রোজালিণ্ডের প্রণয়ভাজন যুবকও (Orlando) তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই প্রণয়ব্যাপারে গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত সিলিয়া রোজালিণ্ডের সমদুঃখ-সুখা সখীর কার্য্য করিয়াছেন; প্রয়োজন হইলেই নায়ক-নায়িকার প্রেম-পরিণামে সহায়তা করিয়াছেন, সাহায্যের প্রয়োজন না হইলে পার্শ্বে থাকিয়া প্রণয়িযুগলের মিলনে (ললিতার ন্যায়) আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। তিনিই দৈবগত্যা অর্ল্যাণ্ডোর দর্শন পাইয়া ভগিনীকে বার্ত্তা আনিয়া দিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিলেন, এ বিষয়ে ফষ্টিনষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিলেন (৩য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য)। আবার তিনি, রোজালিণ্ড বালকবেশে সাজিয়া প্রণয়ীর সহিত যে কৌতুক করিতেন, তাহাতে সানন্দে ও সোৎসাহে যোগদান করিতেন (৪র্থ অঙ্ক ১ম দৃশ্য); প্রণয়ীর অদর্শনে রোজালিণ্ডের পলকে প্রলয় উপস্থিত হইলে হাস্য-পরিহাসে ও সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিতেন (৩য় অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য); প্রণয়ীর সহিত মিলনকালে উভয়ের মিষ্টালাপে আনন্দলাভ করিতেন। প্রণয়ীর বিপৎপাতের সংবাদ পাইয়া যখন রোজালিণ্ড মূর্চ্ছিতা হইলেন (৪র্থ অঙ্ক ৩য় দৃশ্য), তখন সিলিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় তৎপর, সঙ্গে সঙ্গে সত্যগোপনে (রোজালিণ্ডের বালকবেশ) যত্নবতী। এই দৃশ্যে তাঁহার গভীর সমবেদনা পরিস্ফুট।

এইরূপ দৃশ্যের পর দৃশ্যে, রোজালিণ্ডের দুঃখের দিনে সিলিয়া তাঁহার প্রতি কিরূপ স্নেহময়ী মমতাময়ী ছিলেন, তাহার চিত্র আছে। কিন্তু যখন রোজালিণ্ড পিতা ও পতির সহিত মিলিতা হইলেন, তাঁহার পিতা হৃত রাজ্য ফিরাইয়া পাইলেন, সিলিয়াও অভীষ্ট বরে আত্মসমর্পণ করিলেন, সেই সুখের দিনে দুই ভগিনী পরস্পরের সুখে কেমন সুখবোধ করিলেন, সে চিত্র নাটকে প্রদর্শিত হয় নাই। দুই ভগিনী পরস্পরের যা হইলেন, এই শুভসংযোগে কবি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' নীতির অনুসরণ করিয়াছেন।

বিখ্যাত লেখক ল্যাম্ব এই নাটক-অবলম্বনে যে গল্প আখ্যান লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জ্যেষ্ঠতাত হৃত রাজ্য ফিরাইয়া পাইলে ও জ্যেষ্ঠতাত-কন্যা রাজপাটের উত্তরাধিকারিণী হইলে সিলিয়া নিজের জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিতা হইলেন না, বরঞ্চ জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ঠতাত-কন্যার সুখে আনন্দপ্রকাশ করিলেন। ইহা সিলিয়ার চরিত্রানুগত সন্দেহ নাই, কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ার নাটকের শেষে সিলিয়ার মুখ দিয়া এ কথা স্পষ্ট করিয়া বাহির করেন নাই। ইহা 'ভাবগ্রাহী' ল্যাম্বের অনুবৃত্তিমাত্র।

অন্য নাটকের বেলায় যাহাই হউক, এই নাটকখানি পাঠ করিবার সময় পাঠক প্রেমের কাহিনীতে যতই বিভোর হউন না কেন, ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই করিবে।

ইংরেজী সাহিত্যে অন্য কোথায় কোথায় দুই ভগিনীর চিত্র আছে, তৎসমুদয়ের সঙ্কলন করিয়া প্রবন্ধের কলেবর অযথা স্ফীত করিবার প্রয়োজন দেখি না। (১৬) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজকবির অঙ্কিত তিনটি চিত্রের পরিচয়-প্রদানই যথেষ্ট বিবেচনা করি।

---

(১৬) প্রসঙ্গক্রমে গোল্ডস্মিথের বিখ্যাত আখ্যায়িকায় ওলিভিয়া ও সোফিয়া দুই সহোদরা এবং জর্জ্জ এলিয়টের সাইলাস্ মার্নারে Nancy ও Priscilla Lammater দুই সহোদরার উল্লেখ করা যায়।

শেষ কথা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ লেখকগণ বিলাতী সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নভেলরূপ 'বিষবৃক্ষ' রোপণ করিয়াছেন, এবঞ্চ বিলাতী সমাজের দর্পণ বিলাতী সাহিত্য হইতে অনেক বিকৃত আদর্শ আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন, ইংরেজী শিক্ষালাভ ও ইংরেজের চাকরী করিয়া নিমকের গোলাম হইয়া নিমক-হালালী করিবার জন্য হিন্দুর পবিত্র সাহিত্যসরস্বতীতে বিলাতী নোনাজল ঢুকাইয়াছেন, নিপুণ সমালোচকগণ এইরূপ অভিযোগ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই প্রবন্ধে আলোচিত ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার আদর্শ বঙ্কিম-দীনবন্ধু সংস্কৃত বা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পান নাই। কিন্তু সাহিত্যে না থাকিলেও ইহা আমাদের সমাজে অপ্রাপণীয় নহে। অতএব হিন্দু লেখক এই আদর্শ নিজের ঘরে না পাইয়া পরের ঘর হইতে আমদানী করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্তের কোন কারণ নাই। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারই করা যায় যে, বঙ্কিম-দীনবন্ধু এই সুন্দর আদর্শস্থাপনে বিলাতী কাব্য-নাটকের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাতেই বা দোষ কি? বিদেশীয় ভাব ও আদর্শের অনুকরণ-মাত্রই নিন্দনীয় নহে। দেশীয় ভাব ও আদর্শের প্রতিকূল না হইলে, এরূপ অনুকরণ ও অনুসরণ সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলজনক, নূতন অথচ বিশুদ্ধ আদর্শের প্রবর্ত্তক, মধুর ভাবের প্রণোদক, সুন্দর চিত্রের উদ্ভাবক, অতএব প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। ফলতঃ অন্যত্র যাহাই হউক, এক্ষেত্রে ইঁহারা এই সকল চিত্র দ্বারা আমাদের সাহিত্যকে দূষিত না করিয়া ভূষিত করিয়াছেন, ইহা বড় গলা করিয়া বলিতে পারি। এই সুন্দর আদর্শপ্রচারের জন্য আমরা পুনর্ব্বার বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করি।

শ্বাশুড়ী-বৌ।

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি অবলম্বনে।)

গোড়ার কথা।

বাঙ্গালী বধূ সচরাচর শ্বাশুড়ী ও যা লইয়া ঘর করেন। শ্বাশুড়ী-বৌএ ও যাএ যাএ স্নেহবন্ধন থাকিলেই সুখের সংসার হয়।

এই দুইটি সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অদ্য সেই প্রশ্নের বিচার করিব।

ননদ-ভাজের বেলায় যাহা বলিয়াছি, এখানেও সে কথা খাটে। বঙ্কিম-চন্দ্রের যে সকল আখ্যায়িকার নায়ক নায়িকার বিবাহে পরিসমাপ্তি, সেগুলিতে শ্বাশুড়ী ও যাএর কোন প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। সুতরাং 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রাধারাণী' প্রভৃতিতে ইঁহাদিগের সমাগম নাই। 'মৃণালিনী'তে নায়ক-নায়িকার গোপনবিবাহ পূর্ব্বেই সংঘটিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের বিবাহিত জীবনের আরম্ভ আখ্যায়িকার শেষে। এই গ্রন্থে মনোরমার বিবাহ ও 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' হিরণ্ময়ীর বিবাহ যেরূপ রহস্যে জড়িত, তাহাতে তাহাদের বেলায় শ্বাশুড়ী ও যাএর কথা উঠিতেই পারে না। কতকগুলি আখ্যায়িকাতে গ্রন্থকার যেরূপ গোড়াপত্তন করিয়াছেন, তাহাতে শ্বাশুড়ী লইয়া ঘর করার সম্ভাবনা তিরোহিত। 'মৃণালিনী'তে মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র গ্রন্থারম্ভেই 'ভাগা-

---

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ হলে পঠিত। (২রা মার্চ্চ ১৯১৪)। স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ পি এচ্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

হীন'। 'চন্দ্রশেখরে' চন্দ্রশেখরের মাতা স্বর্গলাভ করিলেন, তবে তিনি সাংসারিক সুবিধার জন্য বালিকা শৈবলিনীর পাণিপীড়ন করেন। রাজসিংহ, সীতারাম, 'আনন্দমঠে'র মহেন্দ্রসিংহ, প্রভৃতি ত বহুকাল হইতেই লায়েক। এসব স্থলে গ্রন্থকার আগেভাগেই মুড়ো মারিয়া রাখিয়াছেন। 'রজনী'তে শচীন্দ্রনাথের মাতাপিতা আছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন, অবশ্য ভ্রাতৃবধূও আছেন (যদিও পুস্তকে কোথাও তাঁহার উল্লেখ নাই) ; কিন্তু শচীন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী কি ভাবে শ্বাশুড়ী ও যা লইয়া ঘর করিয়াছিলেন সে প্রসঙ্গ আখ্যায়িকায় উঠে নাই। রজনীকে দ্বিতীয় পক্ষ করিয়া তিনি স্থানান্তরে বাস করিলেন, সুতরাং লেঠা চুকিল, রজনীকে শ্বাশুড়ী ও যা লইয়া ঘর করিতে হইল না। তবে গ্রন্থকার ইহার অবশ্য সঙ্গত কারণ দর্শাইয়াছেন। 'রজনী ফুলওয়ালী ছিল, পাছে কলিকাতায় ইহাতে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতায় বাস করিতেছেন।' ['রজনী'—৫ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ]।

যাএর কথায় একটু মজা আছে। অধিকাংশ স্থলেই বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলির প্রধান অপ্রধান পাত্রগণ মাএর এক ছেলে, সুতরাং তাঁহাদিগের পত্নীদিগের যাএর বালাই নাই। (১) দৃষ্টান্তস্থলে, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, নবকুমার, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, মহেন্দ্রসিংহ, জীবানন্দ, ব্রজেশ্বর, সীতারাম, প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের জ্যেঠতুত ভ্রাতা হরলালকে বিপত্নীক করিয়া গ্রন্থকার এবিষয়ে আমাদিগকে বেশ ফাঁকি দিয়াছেন—ভ্রমরের যা যুটিবারও যো রাখেন নাই। হরলালের পত্নীর জীবদ্দশায় তাঁহার ভ্রমরের সঙ্গে

(১) কেহ কেহ টিপ্পনী কাটেন, 'অথচ বঙ্কিমচন্দ্রেরা চারি সহোদর।' কিন্তু এসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তোলা রুচিসঙ্গত বিবেচনা করি না।

কিরূপ ভাব ছিল, তাহাও পুঁথিতে লেখে না। অপর জ্যেঠতুত ভ্রাতা বিনোদলাল বিবাহিত কি অবিবাহিত তাহাও জানা যায় না। 'রজনী'র কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'রজনী'তে রজনীর পিতা ও পিতৃব্য (হরেকৃষ্ণ দাস ও মনোহর দাস) সম্বন্ধে যে পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, তাঁহারা একত্র বাস করিতেন না, তবে মনোহর ও তৎপত্নী হরেকৃষ্ণের জন্মান্ধ কন্যার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কার দিয়াছিলেন— আদালতের জোবানবন্দীতে এই কথা জানা যায়। কিন্তু সে বিশেষ কারণবশতঃ। ['রজনী'—৩য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।] এই একমাত্র স্থলে যা-এর যৎসামান্য উল্লেখ দেখা যায়।

যে সকল আখ্যায়িকায় নায়িকার বাল্যবিবাহ ঘটিয়াছে ও বিবাহিত জীবনের বৃত্তান্ত আছে, সেইগুলিতেই শ্বাশুড়ীর প্রসঙ্গ উঠিতে পারে। অতএব সেইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। 'ইন্দিরা'য় বিবাহের পর কথারম্ভ হইলেও ইহা বিবাহিত জীবনের ইতিহাস নহে, কেন না ইন্দিরার পতির সঙ্গে প্রকৃত মিলন গ্রন্থশেষে। পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে, গ্রন্থশেষে ইন্দিরার কলঙ্কভঞ্জন হইলে তাঁহার 'শ্বশুর-শ্বাশুড়ী সন্তুষ্ট হইলেন', [২২শ পরিচ্ছেদ] এই কথা মাত্র আছে। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে ইন্দিরার সখী সুভাষিণীর শ্বাশুড়ীকে লইয়া ঘর করার প্রসঙ্গ আছে। 'রাজসিংহে'র পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে চঞ্চলকুমারীর সখী নির্ম্মল-কুমারীর বৃদ্ধা পিসশ্বাশুড়ীর কথা আছে। 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর শ্বাশুড়ী বিবাহের পূর্ব্বেই পরলোকগতা, সুন্দরী ত পিত্রালয়বাসিনী, রূপসীর শ্বাশুড়ী থাকার কথাও শুনি না। 'বিষবৃক্ষে' সূর্য্যমুখীর শ্বাশুড়ী নাই, কিন্তু কমলমণির শ্বাশুড়ীর উল্লেখ আছে, কুন্দর কুলত্যাগিনী শ্বাশুড়ীর কথাও দুই একবার উঠিয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা'র শ্বাশুড়ীর প্রসঙ্গ গ্রন্থকার দু'কথায় শেষ করিয়াছেন। 'আনন্দমঠে' শান্তির

শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ঘর করার কথা পঞ্চম সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের শ্বাশুড়ীর কথা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে শ্বাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক বিশদভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে যে সাতখানিতে বাল্যবিবাহ আছে সেই সাতখানিতেই শ্বাশুড়ীর প্রসঙ্গও আছে। এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্র শ্বাশুড়ী-বৌ সম্পর্কের কিরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

শ্বাশুড়ীর প্রসঙ্গ।

এই সাতখানি আখ্যায়িকার মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' সর্ব্বাগ্রে রচিত। ইহাতে গ্রন্থকার নিতান্ত সংক্ষেপে সারিয়াছেন—'নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন।' 'নবকুমারের মাতা মহাসমাদরে বধূবরণ করিয়া গৃহে লইলেন।' [২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।] শ্বাশুড়ীর কথা এইটুকুমাত্র আছে। এ ক্ষেত্রে শ্বাশুড়ী বিধবা। বুঝা গেল, প্রথম আমলে লিখিত গ্রন্থে, গ্রন্থকারের একটু সঙ্কোচের ভাব রহিয়াছে; গ্রন্থকার শ্বাশুড়ীকে আসরে নামাইতে যেন সাহস পাইতেছেন না, অথচ তাহার জন্য একটা সন্তোষজনক কৈফিয়তও দিতে পারিতেছেন না। (২)

পরবর্ত্তী গ্রন্থ 'বিষবৃক্ষে'ও শ্বাশুড়ী বিধবা কিন্তু এবার একটু রকমফের আছে! এবার গ্রন্থকারের সাহস বাড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—'কমলের শ্বশ্রূ বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি শ্রীশচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থানেই থাকিতেন, কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।' [৫ম পরিচ্ছেদ।] এ ক্ষেত্রে

(২) কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর মনুষ্যসংসর্গের প্রভাব যথাসম্ভব অল্পপরিমাণ করিবার জন্যই গ্রন্থকার এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আর্টের দিক্ হইতে এই কারণ দর্শান যায়। 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্বে' এ কথা বুঝাইয়াছি।

গ্রন্থকার আধুনিক বাঙ্গালীজীবনের একটা বাস্তব দিক্ খোলসা করিয়া দেখাইয়াছেন—কেন না ইহা ঠিক হালের প্রথা। চাকুরীজীবী বাঙ্গালী শীতলা ঘাড়ে করিয়া (৩) কর্ম্মস্থানে চলিয়া যান—আর বৃদ্ধা জননী দেশে কুঁড়ে আগলাইয়া থাকেন ও ভিটায় সন্ধ্যা দেন!

এক্ষেত্রে দেখা গেল, শাশুড়ী পদ্মপত্রের জলের মত টলমল করিতেছেন, পুত্র ও বধূর সংসারে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না—তিনি যেন interloper!

কুন্দর কুলত্যাগিনী শাশুড়ীর কথা অনেকে শুনিতে নারাজ হইবেন, কিন্তু সে কথায় একটি সুন্দর তথ্য নিহিত আছে, তজ্জন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে বাধ্য হইলাম। হরিদাসী বৈষ্ণবী কুন্দকে বলিতেছেন,—

'"তোমার শাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন।...তোমাকে একবার দেখবার জন্য বড়ই কাঁদিতেছেন—আহা! হাজার হোক্ শাশুড়ী। সে ত আর এখানে তোমাদের গিন্নীর কাছে সে পোড়ারমুখ দেখাতে পারবে না—তা তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখা দিয়ে এস না।" কুন্দ সরলা হইলেও বুঝিল যে, সে শাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ-স্বীকারই অকর্ত্তব্য! অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।' [৯ম পরিচ্ছেদ।]

এ সমস্তই অবশ্য দেবেন্দ্র দত্তের কারসাজি—কুন্দকে ধোঁকা দিবার জন্য রচা কথা। কিন্তু কথায় বলে, খোসখবরের ঝুঁটোও ভাল। শাশুড়ীর বেটার বৌকে দেখিবার কতটা প্রাণের টান থাকে, কুলত্যাগিনী হইলেও তাহার সে সাধ-আহ্লাদ মিটে না, এই তথ্যটি গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ইহা সত্য জানিয়াই দেবেন্দ্র দত্ত কুন্দকে ওরূপ ছলনা করিতে সাহসী হইয়াছিল।

(৩) পল্লীগ্রামের স্ত্রীসমাজে এই শ্লেষটুকু খুব প্রচলিত।

'রাজসিংহে' নির্ম্মলকুমারীর পিসশাশুড়ী নিতান্ত দূরসম্পর্কীয়া—নিঃসম্পর্কীয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসির ননদের যায়ের খুল্লতাতপুত্রী ছিল। সৌজন্য-বশতই হউক, আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক,—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত।' [৩য় খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।] সেই 'স্নেহশালিনী পিসী'র স্নেহ মাণিকলাল অপেক্ষা তাহার আশরফির উপরই বেশী ছিল। [৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।] এ অবস্থায় নির্ম্মলকুমারী যে তাঁহার সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের সুরে 'একটা পাতান রকম পিসী আছে' বলিল ইহাতে বোধ হয় কোনও দোষ হয় নাই। [৫ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] নির্ম্মলকুমারী অতি অল্প দিনই মাণিকলালের ঘর করিয়াছিল; এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকার শাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক একেবারে উহ্যই রাখিয়াছেন।

'আনন্দমঠে' পঞ্চম সংস্করণে সংযোজিত একটি গোটা পরিচ্ছেদ আছে। [২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।] তাহাতেই শান্তির শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আবির্ভাব হইয়াছে। 'শ্বশুর শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভৎর্সনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল। পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল। একদিন দ্বার খোলা পাইয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।' তাহার পর—অনেক দিন পরে শান্তি 'শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না,—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।'

বুঝিলাম, শান্তি যতদিন শাশুড়ীর সহিত ঘর করিয়াছিল, ততদিন ঠাকুরাণী শান্তিকে বড় শান্তি পাইতে দেন নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শাশুড়ীকে বৌকাঁটকী বলিয়া সাব্যস্ত করিলে অন্যায় হইবে। শান্তির অশান্ত স্বভাবই এই ব্যবহারের জন্য দায়ী। শান্তির অসাধারণত্বের

মর্য্যাদা সাধারণ শ্বাশুড়ীতে কি করিয়া বুঝিবেন? জীবানন্দ বুঝিয়াছিলেন, তাই 'মাকে বুঝাইয়া, মার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন' এবং ভগিনীপতি-প্রদত্ত ভূমিতে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া 'শান্তিকে লইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।'

এখানে শ্বাশুড়ীকে সধবা ও বিধবা দুই অবস্থাতেই দেখা গেল। এবং ইহাও বুঝা গেল যে, তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনই শ্বাশুড়ী-বৌএ মিলমিশ হয় নাই।

পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট চারিখানি আখ্যায়িকার মধ্যে প্রথম তিনখানিতে শ্বাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক একপ্রকার উহ্য আছে; শেষখানিতে বাস্তব জীবনের কুৎসিত দিক্‌টাই দৃষ্টিগোচর হইল। এক্ষণে দেখা যাউক, অপর তিনখানিতে এই চিত্র কিরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল।'

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভিত্তি একান্নবর্ত্তি-পরিবারে দায়াদগণের মধ্যে সম্পত্তি-বিভাগ-সমস্যার উপর। অতএব ইহাতে একান্নবর্ত্তি-পরিবারের চিত্র এবং তাহারই একাংশ শ্বাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক কিরূপে চিত্রিত হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। ভ্রমর স্বামীর উপর অভিমান করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য বেচারা, শুধু গোবিন্দলালের কাছে কেন, বঙ্গীয় সমালোচকগণের কাছেও, অনেক খোঁটা খাইয়াছে। সে কথার বিচারের এ স্থল নহে। কিন্তু এ কথা জোর করিয়া বলিব, ভ্রমর একদিনের তরেও শ্বাশুড়ী বা জ্যেঠশ্বশুরের অসম্মান করে নাই। এ ক্ষেত্রে ভ্রমর খাঁটি হিন্দুবধূ। এমন কি, উইলচুরি ব্যাপারে রোহিণীর জন্য যখন ক্ষমাভিক্ষার প্রয়োজন হইল, তখন ভ্রমর দয়াবতী হইয়াও 'শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না—বড় লজ্জা

করে, ছি! অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গেলেন।' [১ম খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ।] বুঝিলাম, ভ্রমর একালের বধূদিগের মত 'ব্যাপিকা' নহে।

যখন গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভুলিবার জন্য বিদেশে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন, ভ্রমর শুনিয়া বাহানা ধরিল, 'আমিও যাইব। কাঁদাকাটি হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শ্বাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না।' [১ম খণ্ড ১৯শ পরিচ্ছেদ।] শ্বাশুড়ীর কথা অমান্য করা তাহার সাধ্য ছিল না। ইহাও খাঁটি হিন্দু ঘরের কথা। শ্বাশুড়ীর কাযটিও অস্বাভাবিক নহে।

গোবিন্দলালের বিচ্ছেদে যখন ভ্রমরের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, তৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—'তাস খেলা বন্ধ করিল—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শ্বাশুড়ী রাগ করেন।' [১ম খণ্ড ২০শ পরিচ্ছেদ]। অবশ্য এটা ভ্রমরের ছলমাত্র, কিন্তু শ্বাশুড়ীদের এরূপ টিক্ টিক্ করা একটা রোগ। মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় (২য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক) এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ'এও দেখা যায় যে, শ্বাশুড়ীর সাড়া পাইয়াই বধূ জড়সড় হইয়া তাস লুকাইতে ব্যস্ত। ঝী-বৌরা তাস খেলিয়া কুড়ের সর্দ্দার হইয়া যায়, সেই জন্যই ঘরণী গৃহিণীরা তাহাদিগকে কায ফেলিয়া খেলা করিতে দেখিলে টিক্ টিক্ করেন।

কিন্তু এরূপ একটু খিটিমিটি করিলেই তাহাতে শ্বাশুড়ী মন্দ হয় না। ঐ পরিচ্ছেদেই দেখি, ভ্রমর যখন 'জ্বর হইয়াছে' ছল করিল, তখন শ্বাশুড়ী বৌমার বাড়াবাড়িতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া স্নেহময়ী জননীর মত 'কবিরাজ দেখাইয়া, পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন, যে বৌমাকে ঔষধগুলি খাওয়াইবি।' স্বামিসোহাগিনী

ভ্রমর তখন অভিমানিনী—হাজার হোক ছেলেমানুষ—তাই 'ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া, জানেলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।' ইহাতে কেহ কি তাহাকে শ্বাশুড়ীর অবাধ্য বলিয়া নিন্দা করিবেন? রোহিণীর কথা লইয়া ক্ষীরি চাকরাণীর উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রমর তাহার উপর অত্যাচার করিল বটে, কিন্তু তথাপি শ্বাশুড়ীর প্রতি সম্মান বিস্মৃত না হইয়া ভ্রমর বলিয়াছে, 'ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব।'

তাহার পর, ভ্রমরের সেই সাংঘাতিক ভুল, গোবিন্দলালের উপর অভিমান করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়া। ইহাতে ভ্রমর বেশ একটু জুয়াচুরি খেলিয়াছিল বটে, কিন্তু এরূপ ফাঁকি গৃহস্থঘরে অনেক বধূই দিয়া থাকে। ইহা বাস্তব চিত্র। (ভ্রমরের মাতার 'উদ্দেশে ভ্রমরের শ্বাশুড়ীকে একলক্ষ গালি' দেওয়াও সেই বাস্তব চিত্রেরই অংশ।) [১ম খণ্ড ২৪শ পরিচ্ছেদ।]

গোবিন্দলাল গৃহে ফিরিলে গোবিন্দলালের মাতা বৌমার উপর রাগ করিয়া মাতার কর্ত্তব্য, শ্বাশুড়ীর কর্ত্তব্য, সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। কিন্তু গোবিন্দলাল সে ক্ষেত্রে 'ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন'। [১ম খণ্ড ২৪শ পরিচ্ছেদ।] সুতরাং তাঁহার মাতাকে নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরদিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন।' (১ম খণ্ড ২৭শ পরিচ্ছেদ)।

এ পর্য্যন্ত দেখা গেল, ভ্রমরের শ্বাশুড়ী কখন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। তাহার পর নূতন উইলের সূত্রে যখন গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের ব্যবধান আরও বাড়িয়া গেল, সেই সময়ে শ্বাশুড়ীর ব্যবহার নিন্দার্হ সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই বিশদভাবে সেটুকু বুঝাইয়াছেন।

'আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার-মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে সদুপদেশে, স্নেহবাক্যে এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতীকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন ; কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্নাও হইয়াছিলেন। (৪) যে স্নেহের বলে ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন, ভ্রমরের উপর তাঁহার সে স্নেহ ছিল না। পুত্র থাকিতে পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল।……তিনি ভাবিলেন যে, পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্যা হইয়া ইহজীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্ম-পরায়ণা, তিনি স্বামিবিয়োগকাল হইতেই কাশীযাত্রা কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রস্নেহবশতঃ এতদিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল।

তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, "কর্ত্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল। তুমি পুত্রের কাজ কর ; এই সময়ে আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।"

---

(৪) বাঙ্গালীর ঘরে বৌকাঁটকী শাশুড়ীর অভাব নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সে কুৎসিত চিত্র আঁকেন নাই। এ স্থলে শাশুড়ী বধূর প্রতি বিরূপ বটে, কিন্তু কারণ সাধারণ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শান্তির শাশুড়ীকেও বৌকাঁটকী বলিয়া দোষ দেওয়া যায় না।

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করে নাই।' [১ম খণ্ড ৩০শ পরিচ্ছেদ।]

এবার ভ্রমরের কাহাকেও না বলিয়া না কহিয়া পিত্রালয় যাওয়া অন্যায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, কি জন্য শ্বাশুড়ী ও স্বামী তাঁহার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন ; এবং তাহাই শোধরাইবার জন্য অর্থাৎ স্বামীকে সমস্ত বিষয় দেওয়ার দানপত্র প্রস্তুত করাইবার জন্য তিনি এরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল।

গোবিন্দলাল 'মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শ্বাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল। আসিয়া শ্বাশুড়ীর চরণ ধরিয়া অনেক বিনয় করিল ; শ্বাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা, আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসার-ধর্ম্মের কি বুঝি ? মা সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।" শ্বাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড় ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।" ভ্রমর কিছুই বুঝিল না—কেবল কাঁদিতে লাগিল।' [১ম খণ্ড ৩০শ পরিচ্ছদ।] আমরা দেখিলাম, ভ্রমর মনের এমন অবস্থায়ও শ্বাশুড়ীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য ভুলে নাই। শ্বাশুড়ীও মুখে মিষ্ট কথা বলিতে কসুর করিলেন না। (৫)

---

(৫) বধূর প্রতি পুত্রের অন্যায় আচরণ দেখিয়া শেক্স্‌পীয়ারের All's Well That Ends Wellএ মাতা পুত্রের উপর বিরক্ত, পুত্রবধূর প্রতি স্নেহশীলা, এরূপ চিত্র এখানে নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। গোবিন্দলালের মাতার অতটুকু তলাইয়া বুঝিবার মত স্থিরবুদ্ধি ছিল না।

তাহার পর যখন গোবিন্দলাল বহু বৎসর ধরিয়া নিরুদ্দেশ, তখনও ভ্রমর শ্বাশুড়ীর শরণাগতা, তাঁহাকে চিঠি লেখাইয়া সংবাদ আনিতেন, ইহাও একাধিক স্থলে উল্লিখিত আছে। [২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ]। তিনি স্বর্গগতা হইলে সে বন্ধনও টুটিল।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল, ভ্রমরের অন্য যে দোষই থাকুক না কেন, শ্বাশুড়ীর প্রতি সে বরাবরই ভক্তিমতী। শ্বাশুড়ীর প্রকৃতিতে কি দোষ ছিল তাহা গ্রন্থকার স্পষ্টবাক্যেই বলিয়াছেন। ভ্রমর আদর্শপত্নী নহে, কিন্তু আদর্শবধূ বটে। সে শ্বাশুড়ীর যেটুকু অবাধ্যতা করিয়াছে, তাহা তাহার ছেলেমানুষি এবং স্বামীর উপরে দুর্জ্জয় অভিমানের ফল।

এক্ষেত্রেও শ্বাশুড়ী বিধবা, তবে পুস্তকের প্রথম অংশে তাঁহার ভাশুর বর্ত্তমানে তিনি অবশ্য সর্ব্বময়ী কর্ত্রী নহেন।

'ইন্দিরা।'

'ইন্দিরা'য় (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে) সুভাষিণীর শ্বাশুড়ী লইয়া ঘর করার চিত্রটি বেশ পরিস্ফুট। এ ক্ষেত্রে শ্বাশুড়ী সধবা, কিন্তু কর্ত্তাটি মাটির মানুষ, সুতরাং গৃহিণীই সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি দোষে গুণে জড়িত মানুষ,—কিন্তু বৌকে স্নেহ করেন। মাসীর বাড়ী 'সুবো' ইন্দিরাকে শ্বাশুড়ীর পরিচয় দিল—'মাকে লইয়া একটু গোল আছে। তিনি একটু খিট্‌মিটে—তাঁকে বশ করিয়া লইতে হইবে।' [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] শ্বাশুড়ীর অসাক্ষাতেও যে সুভাষিণী তাঁহাকে 'মা' বলিয়া পরিচয় দিল, (অসাক্ষাতে রাজার মাকেও ডাইনী বলে!) ইহাতে বুঝিলাম সুভাষিণী শ্বাশুড়ীকে ভালবাসে, ভক্তি করে। পর-পরিচ্ছেদে বর্ণিত শ্বাশুড়ী-বৌএ কথোপকথনের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'গৃহিণী ঠাকুরাণী বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে?"

বধূ বলিল, "তুমি (৬) একটি রাঁধুনী খুঁজিতেছিলে, তাই একে নিয়ে এসেছি।"

গৃহিণী। কোথায় পেলে ?

বধূ। মাসীমা দিয়াছেন।

গৃ। বামন না কায়েৎ ?

ব। কায়েৎ।

গৃ। আঃ তোমার মাসীমার পোড়াকপাল! কায়েতের মেয়ে নিয়ে কি হবে? একদিন বামনকে ভাত দিতে হলে কি দিব ?

ব। রোজ ত আর বামনকে ভাত দিতে হবে না—যে কয়দিন চলে চলুক—তার পর বামনী পেলে রাখা যাবে—তা বামনের মেয়ের ঠ্যাকার বড়—আমরা তাঁদের রান্নাঘরে গেলে হাঁড়িকুড়ি ফেলিয়া দেন—আবার পাতের প্রসাদ দিতে আসেন! কেন আমরা কি মুচি ?

আমি মনে মনে সুভাষিণীকে ভূয়সী প্রশংসা করিলাম—কালিভরা লম্বা বোতলটাকে সে মুঠোর ভিতর আনিতে জানে দেখিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "তা সত্যি বটে মা,—ছোট লোকের এত অহঙ্কার সওয়া যায় না। তা এখন দিনকতক কায়েতের মেয়েই রেখে দেখি। মাইনে কত বলেছে ?"

ব। তা আমার সঙ্গে কোন কথা হয় নাই।

গৃ। হায়রে কলিকালের মেয়ে! লোক রাখ্‌তে নিয়ে এসেছ, তার মাইনের কথা কও নাই ?

* * *

'সুভাষিণী মাঝে হইতে বলিল, "কেন মা, সমস্ত লোকে কি কাজ কর্ম্ম পারে না ?"

---

(৬) এ 'তুমি' ভালবাসার চিহ্ন, অবজ্ঞার নহে।

গৃ। দূর বেটি পাগলের মেয়ে! সমস্ত লোক কি লোক ভাল হয়?

সু। সে কি মা! দেশ শুদ্ধ সব সমস্ত লোক কি মন্দ!

গৃ। তা নাই হলো—তবে ছোট লোক যারা খেটে খায় তারা কি ভাল?

এবার কান্না রাখিতে পারিলাম না। কাঁদিয়া উঠিয়া গেলাম। কালির বোতলটা পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিল,—

ছুঁড়ী চল্‌লো না কি?"

সুভাষিণী বলিল, "বোধ হয়।"

গৃ। তা যাক্‌গে।

সু। কিন্তু গৃহস্থ-বাড়ী থেকে না খেয়ে যাবে? উহাকে কিছু খাওয়াইয়া বিদায় করিতেছি।' [সপ্তম পরিচ্ছেদ।]

দেখা গেল, শ্বাশুড়ী-বৌএ সম্পর্ক কেমন স্নেহময়!

আর একদিনের কথা বলি। গৃহিণী ইন্দিরার রান্না খাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে পাচিকাবৃত্তিতে বাহাল করিয়া সুভাষিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা দেখো গো, এঁকে যেন কেউ কড়া কথা না বলে—আর তুমি ত বলবেই না, তুমি তেমন মানুষের মেয়ে নও।" [অষ্টম পরিচ্ছেদ।] আর এক স্থলে ইন্দিরা বলিতেছেন,—"গিন্নী তা'র হাতে কলের পুতুল, কেন না সে রমণের বৌ—রমণের বৌর কথা ঠেলে কা'র সাধ্য?" [নবম পরিচ্ছেদ।] এই টুকুই খাঁটি কথা। বেটার বৌ বলিয়াই তাহার উপর স্নেহমমতা; যে মা সন্তানকে ভালবাসেন, তিনি কি সাধের বৌমাটিকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন? সে যে কত সাধের সামগ্রী! বঙ্কিমচন্দ্র অল্প কথায় এই সুন্দর তথ্যটুকু ফুটাইয়াছেন। (৭)

(৭) সব সময়ে শ্বাশুড়ীরা এ কথাটি বুঝেন না। 'একান্নবর্ত্তী পরিবার' প্রবন্ধ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সুভাষিণী শাশুড়ীর প্রকৃতি বুঝিত, এবং বুঝিত বলিয়াই তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল। এ বিষয়ে তাহাকে একটু কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ইহাকে 'কপটাচার' বলিলে নিতান্তই বাড়াবাড়ি হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁহার দুর্ব্বলতাটুকুও জানে, তাহা লইয়া তাঁহার অসাক্ষাতে একটু ফষ্টিনষ্টিও করে [পাকাচুল তোলার প্রসঙ্গ,—নবম পরিচ্ছেদে]। কিন্তু ইহাকেও অশ্রদ্ধা অভক্তি বলিলে নিতান্তই বাড়াবাড়ি হয়; হাস্যময়ী স্নেহময়ী সুভাষিণীর চরিত্রে এটুকু বেশ মানাইয়া যায়। ইন্দিরা স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইলে সুভাষিণী তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহাতেও শাশুড়ীর কথা লইয়া একটু রঙ্গ করিয়াছে বটে [দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ], কিন্তু তাহা নির্দ্দোষ আমোদ। বাস্তবিক, এই গ্রন্থে গ্রথিত শাশুড়ী-বৌএর চিত্রখানি বড় সুন্দর। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের রচনা।

'দেবী চৌধুরাণী।'

'দেবী চৌধুরাণী'ও বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের লেখা। এ গ্রন্থেও শাশুড়ী সধবা, কিন্তু কর্ত্তাটি রাশভারী মানুষ, 'ইন্দিরা'য় বর্ণিত রামরাম দত্তের মত মাটির মানুষ নহেন। সুতরাং এখানে শাশুড়ী সম্পূর্ণ স্বাধীনা নহেন, তাঁহার প্রসঙ্গে শ্বশুরের কথাও তুলিতে হইবে।

প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখিতেছি, দারিদ্র্য-দুঃখক্লিষ্টা প্রফুল্ল বলিতেছে—"শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে যোটে তবে খাইব—নহিলে আর খাইব না।......আমাকে সঙ্গে করিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আইস।" "যাহাদের উপর আমার ভরণ-পোষণের ভার তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব—তাহাতে আমার লজ্জা কি?"

"আমি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব—আমার ত সব আছে ?" ইহাই হইল প্রকৃত হিন্দুবধূর কথা। শ্বশুরের অন্ন মানের অন্ন, শ্বশুরঘর বজায় থাকিলেই সুখ-সৌভাগ্য। শ্বশুরকর্ত্তৃক অকথনীয় অপমানে অপমানিতা হইয়াও প্রফুল্ল এ কথা ভুলে নাই।

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা এমন গুণের বধূর শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সাক্ষাৎ পাই। (প্রথম দুই বেহাইনে একটু কথা-কাটাকাটি হইল—বাঙ্গালীর কুটুম্বিতার বাস্তব-চিত্র—কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই।) শাশুড়ীবৌএর কথাবার্ত্তার একটু পরিচয় দিই—

"শাশুড়ী বলিল,

"তোমার মা গেল, তুমিও যাও।"

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। নড় না যে ?

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। কি জ্বালা! আবার কি তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে না কি ?

এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল ; চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর ক'র্‌তে পেলাম না।" মন একটু নরম হলো।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।"

গিন্নী। তা কি করিব মা—আমার কি অসাধ যে তোমায় নিয়ে ঘর করি ? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে ক'র্‌বে বলে, কাজেই তোমাকে ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে ? আমি তোমার সন্তান নই ?

শ্বাশুড়ীর মন আরও নরম হলো। বলিলেন, "কি কর্‌ব মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, "হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?"

গিন্নী আর বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে, তিনি কি বলেন। তুমি এখানে ব'সো মা, ব'সো।"'

প্রফুল্লর চাঁদপানা মুখ, মিষ্ট কথা ও সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট 'মা' সম্বোধন গিন্নীর মনে যে সুখের ও স্নেহের হিল্লোল তুলিয়াছে তাহা ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 'আমার কি অসাধ যে তোমায় নিয়ে ঘর করি?' এই কথা কয়টিতেই তাঁহার স্নেহশীল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল। দুইটি পরিচ্ছেদের একটিতে বধূর প্রকৃতি ও অপরটিতে শ্বাশুড়ীর প্রকৃতি কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে!

প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে গৃহিণী কর্ত্তার কাছে মোকদ্দমার তদ্‌বিরে গেলেন, অনেক ওকালতী করিয়াও হারিয়া আসিলেন; কিন্তু এততেও গৃহিণীর যে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বধূকে ঘরে লওয়া, ইহা বেশ বুঝা গেল। এই পরিচ্ছেদে শ্বাশুড়ী-বৌএর প্রথম সাক্ষাতেই শ্বাশুড়ীর স্নেহ-সম্বোধন "কোথা ছিলে মা?" ও প্রফুল্লকে মর্ম্মান্তিক সংবাদ দিবার সময়ও করুণামাখান সমবেদনাপূর্ণ কথা। "আহা! তোমারই বাড়ী ঘর বাছা—তা' কি কর্‌ব? তোমার শ্বশুর কিছুতেই মত করেন না।"—ইহাতেও শ্বাশুড়ীর মধুর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল।

'প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল। শ্বাশুড়ীর বড় দয়া হইল।

গিন্নী মনে মনে কল্পনা করিলেন--আর একবার নথনাড়া দিয়া দেখিব। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলেন না—কেবল বলিলেন, "আজ আর কোথায় যাইবে ? আজ এইখানে থাক। কাল সকালে যেও।"'

গিন্নী প্রতিজ্ঞামত আর একবার চেষ্টাচরিত্র করিয়া দেখিলেন। কিন্তু কর্ত্তা কিছুতেই বাগ মানিলেন না। শেষে যখন কর্ত্তা পুত্র ব্রজেশ্বরকে ডাকাইয়া 'বাগ্দী বৌ'কে হাঁকাইয়া দিতে বলিলেন, তখনও গিন্নী স্নেহার্দ্র-স্বরে বলিলেন—"ছি! বাবা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল না।……তা যা কর, ভাল কথায় বিদায় করিও!"' [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।]

হরবল্লভ রায়ের ব্যবহার কদর্য্য বলিয়া তাঁহার উপর আমাদের বিজাতীয় ক্রোধ হয় বটে, কিন্তু সে গুরুতর অপবাদগ্রস্তা পুত্রবধূকে তিনি ঘরে লনই বা কি করিয়া ?

প্রফুল্ল সাগরকে বলিতেছে—"থাক্‌ব ব'লেই ত এসেছি। থাক্‌তে পেলে ত হয়।" [১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।] ইহাও হিন্দুবধূর কথা।

এদিকে প্রফুল্ল সাগরের কল্যাণে যখন নারীজন্ম সার্থক করিল, তখনও সে সেই ধীরতার, সেই বধূচিত নম্রতার পরিচয় দিল। একালের মেয়ে হইলে স্বামীর সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিত, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে ছাটিয়া ফেলিত, ব্রজেশ্বরের আদর পাইয়া মাথায় চড়িয়া বসিত। কিন্তু প্রফুল সেরূপ উজ্জাট্ট স্বভাবের কোন পরিচয় দেয় নাই। পরন্তু ব্রজেশ্বর যখন রাত্রিবাসের পর বাপের কাছে পত্নীর জন্য আর্‌জী পেশ্ করিতে যাইতে চাহিল, তখন প্রফুল্লই বারণ করিল। সে বলিল, 'তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না। তাতে আমি সুখী হইব না।' [১ম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] হিন্দুবধূ এই ভাবেই শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর মর্য্যাদা রাখেন।

এ ক্ষেত্রে ইহা বলিলেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এত বড় দজ্জাল মেয়ে নয়ান বৌ—সেও সাগরের উপর চটিলে নিজে হাতে তাহার শাস্তির ভার লয় না—বলে 'আমি ঠাকরুণকে গিয়া বলিয়া দিই, তুই বড় মানুষের মেয়ে ব'লে আমায় যা ইচ্ছা তাই বলিস্।' [১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] আবার শ্বাশুড়ী এমন কটুস্বভাবা পুত্রবধূকেও মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। সাগর বৌ যখন স্বামীর নামে কৈবর্ত্ত অপবাদ দিয়া নয়ান বৌএর সঙ্গে রঙ্গ করিবার জন্য সতীনবাদ সাধিল, তখনও নয়নতারা গিন্নীর কাছে গিয়া নালিশ করিল। গিন্নী বলিলেন "তুমি বাছা, পাগল মেয়ে। বামনের ছেলেয় কি কৈবর্ত্ত বিয়ে করে গা? তোমাকে সবাই ক্ষেপায়, তুমিও ক্ষেপ।"' [২য় খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদ।] কথাগুলি কত স্নেহমাখান! তাহার পরেই গিন্নী যে কথাগুলি বলিলেন তাহাও বড় দরদের। "যদি সত্যই হয়, তবে বৌ বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌ব। বেটার বৌ ত আবার ফেল্‌তে পার্‌ব না।" পাকা কথা। হাজার হউক, এবার তিনি ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝেন নাই বলিয়া এখন আপশোষ হইয়াছে; একমাত্র পুত্র ব্রজেশ্বরের দশা দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে।

তাহার পর অদ্ভুত-ঘটনাচক্রে প্রফুল্ল, ওরফে দেবী চৌধুরাণী, যখন স্বামীর দেখা পাইলেন এবং তিনি ডাকাইতি করেন বলিয়া ব্রজেশ্বর ঘৃণা প্রকাশ করিলেন, তখনকার কথা বলি—

'যখন ব্রজেশ্বরের পিতা প্রফুল্লকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তখন প্রফুল্ল কাতর হইয়া শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি অন্নের কাঙ্গাল, তোমরা তাড়াইয়া দিলে—আমি কি করিয়া খাইব?" তাহাতে শ্বশুর উত্তর দিয়াছিলেন, "চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইও।" প্রফুল্ল মেধাবিনী—সে কথা ভুলে নাই। ভুলিবার কথাও

নহে। আজ ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ডাকাইত বলিয়া, এই ভর্ৎসনা করিল; আজ প্রফুল্লের সেই উত্তর ছিল। প্রফুল্লের এই উত্তর ছিল, "আমি ডাকাইত বটে—তা এখন এত ভর্ৎসনা কেন? তোমরাই ত চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইতে বলিয়াছিলে। আমি গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিতেছি।" এ উত্তর সম্বরণ করাই যথার্থ পুণ্য। প্রফুল্ল সে পুণ্য সঞ্চয় করিল—সে কথাও মুখে আনিল না।' [৩য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।] গ্রন্থকার নিজেই সব কথা বলিয়া দিয়াছেন। টীকা অনাবশ্যক।

ব্রজেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে আমার ঘরণী গৃহিণী করিব," তখনও প্রফুল্ল হিন্দুবধূর মত জিজ্ঞাসা করিল, "আমার শ্বশুর কি বলিবেন?" [৩য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।]

অতীত-জীবনে শ্বশুরকর্ত্তৃক বার বার লাঞ্ছিতা হইয়াও তাঁহার শ্বশুরের উপর ভক্তি অটল। শেষবারে শ্বশুর গোইন্দাগিরি করিতে আসিলেও, তিনি শ্বশুরের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নিজের—এমন কি প্রাণাধিক স্বামীরও—প্রাণ তুচ্ছ করিলেন। তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত ঘটনা-পরম্পরার আমূল উল্লেখ করিয়া আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। কৌশলক্রমে শ্বশুরকে একটু ভয়-প্রদর্শন, তাঁহাকে লইয়া একটু কৌতুক করা, ইত্যাদি নানা ব্যাপার হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সব নিশি ঠাকুরাণীর কীর্ত্তি। শ্বশুরের প্রাণরক্ষার পরেও যখন ব্রজেশ্বর বলিলেন, "তুমি আমার ঘরে চল, ঘর আলো হইবে। তুমি না যাও—আমি যাইব না।" তখনও প্রফুল্লর সেই কথা—"আমি ঘরে গেলে, আমার শ্বশুর কি বলিবেন?" [৩য় খণ্ড ১০ম পরিচ্ছেদ।] তাহার পর ব্রজেশ্বরের কৈফিয়তে 'প্রফুল্ল সন্তুষ্ট হইল।' দেখা গেল,—শান্তির ও ইন্দিরার বেলায় যে টুকু ত্রুটি ছিল, গ্রন্থকার এবার তাহা সারিয়া লইয়াছেন।

আর একবার শ্বাশুড়ীর কথা তুলিব। শ্বাশুড়ী ‘বরণ করিবারে সময়ে একবার ঘোমটা খুলিয়া বধূর মুখ দেখিলেন’, চিনিলেন, চোখের জল ফেলিলেন তা’র পরে ব্রজেশ্বরকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, এ হারাধন আবার কোথা পেলে বাবা?” তখন ‘গিন্নীর চোখে জল পড়িতে-ছিল।’ [৩য় খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদ।] যথার্থ স্নেহময়ী শ্বাশুড়ী। এবার কর্ত্তাকে রাজি করিবার ভার তিনি লইলেন।

‘গিন্নী। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, বাপ, আমিই সব বলিব। বৌভাতটা হইয়া যাক্। তুমি কিছু ভাবিও না। এখন কাহারও কাছে কিছু বলিও না।

* * * *

পাকস্পর্শের পর গিন্নী, আসল কথাটা হরবল্লভকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। বলিলেন যে, “এ নূতন বিয়ে নয়—সেই বড় বউ।”

* * * *

হর। এতদিন সে মেয়ে কোথায় কার কাছে ছিল?

গিন্নী। তা আমি ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসাও করিব না। ব্রজ যখন ঘরে আনিয়াছে, তখন না বুঝিয়া সুঝিয়া আনে নাই।

হর। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গিন্নী। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। তুমি একবার কথা কহিয়াছিলে, তার ফলে, আমার ছেলে আমি হারাইতে বসিয়াছিলাম। আমার একটী ছেলে। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। যদি তুমি কোন কথা কহিবে, তবে আমি গলায় দড়ি দিব।

হরবল্লভ এতটুকু হইয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না।

'আমরা স্বীকার করি, গিন্নী এবার বড় গিন্নীপনা করিয়াছেন। যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি?' [৩য় খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদ।]

ইহাই প্রকৃত শ্বাশুড়ী-গিরি—গোবিন্দলালের মাতার সঙ্গে কত প্রভেদ!

তাহার পর প্রফুল্লর কথা বলি। 'যখন সাগর জিজ্ঞাসা করিল "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে?...রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে?" তখন প্রফুল্ল উত্তর করিল—"ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার-ধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।"' [৩য় খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ।]

'কয়েক মাস থাকিয়া সাগর দেখিল, প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল। শ্বাশুড়ী প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন। শেষ প্রফুল্ল যে কাজ না করিত, সে কাজ তাঁর ভাল লাগিত না। শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রফুল্লকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করিত না, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার উপর তাঁহাদের এতটাই শ্রদ্ধা হইল।' [৩য় খণ্ড ১৪শ পরিচ্ছেদ।]

এই প্রফুল্লই আদর্শবধূ। ব্রজেশ্বর-জননীও স্নেহময়ী শ্বাশুড়ীর আদর্শ। এ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে সাতখানিতে শ্বাশুড়ী-বৌএর প্রসঙ্গ আছে, এবং তন্মধ্যে তিনখানিতে পূর্ণায়তন চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাও দেখা গেল যে, শেষোল্লিখিত তিনখানিতে ভ্রমর, সুভাষিণী ও বিশেষভাবে প্রফুল্ল আদর্শবধূ এবং সুভাষিণীর ও প্রফুল্লর শ্বাশুড়ী প্রকৃতই স্নেহময়ী। বাঙ্গালীর ঘরে শ্বাশুড়ী-বৌএর সদ্ভাব-সম্প্রীতি খুব সুলভ পদার্থ নহে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র সাতখানি আখ্যায়িকার মধ্যে কেবল দুইখানিতে উভয়ের সদ্ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহাতে বিস্মিত বা ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। বরং ননদ-ভাজের ন্যায় শ্বাশুড়ী-বৌএর সদ্ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি সুন্দর আদর্শের প্রচার করিয়াছেন বলিয়া প্রশংসাভাজন।

প্রতিকূল মতের বিচার।

তথাপি প্রতিকূল সমালোচকগণ সময়ে অসময়ে বলিয়া বসেন যে,—বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে একান্নবর্ত্তি-পরিবারের প্রসঙ্গ নাই, শ্বাশুড়ী-বৌএ স্নেহসম্পর্ক নাই, মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তির আদর্শ নাই, সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত নাই, ঘরগৃহস্থালীর খবর নাই, শিশুর খেলা নাই, মাতৃভাবের বিকাশ নাই, বাস্তব-জীবনের চিত্র নাই—আছে কেবল নায়ক-নায়িকার নভেলী প্রেম; দুটিতে মুখোমুখি করিয়া কেবল 'ভালবাসি ভালবাসি' বুলি সাধিতেছে—যেন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর প্রহসনের 'বৌমা'। প্রতিকূল সমালোচকগণ আরও গলা চড়াইয়া বলেন,—বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীচরিত্রগুলি যেন টবের ফুল, কাশ্মীরী বারাণ্ডায় টবে টবে একা একা ফুটিয়া থাকে, বাগানের ফুলের মত পাঁচটার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে জানে না, খোলা জমির মাটী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া, পাঁচটা

গাছপালার সঙ্গে আলো ও বাতাস ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইয়া, বাড়িয়া উঠিতে জানে না।

প্রতিকূল সমালোচকগণ ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে মন্তব্য-প্রকাশ করেন,—এ সব বিলাতী নমুনার (প্যাটার্নের) হুবহু নকল। ইংরেজী নভেলে ছেলে সাবালক হইলেই নাটার ফলের মত মা-বাপের সংসার হইতে ছট্‌কাইয়া পড়ে, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয় ; সুতরাং ইংরেজ-নারীর শ্বাশুড়ী বা যাএর সঙ্গে ঘর করা ইংরেজসমাজের স্বাভাবিক ব্যবস্থা নহে। বৃদ্ধা বিধবা শ্বাশুড়ীর সঙ্গে বৌরাণীর একত্র বাস করার দৃষ্টান্ত ক্কচিৎ ইংরেজসমাজে বা ইংরেজী নভেলে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বিলাতীসভ্যতার মোহে অভিভূত হইয়া আমাদের একান্নবর্ত্তি-পরিবারকে 'কাকসমাকুল বটবৃক্ষে'র সহিত উপমিত করিয়াছেন (কথায় বলে—'কাক উড়ে চিল পড়ে, শঙ্খচিলে বাসা করে'), তিনি আমাদের সমাজিক প্রথাকে হেয় ও অশ্রদ্ধেয়, এবং বিলাতী প্রথাকে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং বিলাতী আদর্শের অনুযায়ী নূতন ধরণের পারিবারিক জীবনের আদর্শ প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সুতরাং একান্নবর্ত্তি-পরিবার-প্রথার প্রতি তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা। তিনি বিলাতী নভেলের অনুকরণে ও অনুসরণে এবং বিলাতী সামাজিক প্রথার অনুমোদনে আমাদের পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে বিদেশীয় বিজাতীয় আদর্শ আমদানী করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থপাঠে আমাদের রুচি বিকৃত, প্রবৃত্তি পরাকৃত, প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত এবং সমাজ ও ধর্ম্ম পর্য্যুদস্ত ও বিপর্যাস্ত হইয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

প্রতিকূল সমালোচনা-রূপ কর্দ্দমবৃষ্টিতে বোধ হয় পাঠকগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। দেখি, এই ক্ষুদ্র ভাণ্ড হইতে নির্ম্মল জল ঢালিয়া কাদা ধুইয়া ফেলিতে পারি কি না।

প্রতিপক্ষের কথার ভাবে যেন মনে হয়, আমাদের সাহিত্যে আবহমান কাল যে ভাবের ধারা চলিয়া আসিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার জবরদস্তিতে সেই স্রোতের গতি ভিন্ন খাতে ফিরাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক কি তাহাই? কথাটার আনুপূর্ব্বিক বিচার করিয়া দেখা যাউক।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য।

প্রথমে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথাই তুলি। কৃত্তিবাস বা কাশীরাম, ঘনরাম বা মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ বা কেতকাদাস, রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র, একান্নবর্ত্তি-পরিবারের চিত্র, শ্বাশুড়ী-বৌএ স্নেহসম্পর্কের চিত্র, যাএ যাএ সদ্ভাব ও প্রীতিবন্ধনের চিত্র, কি ইহা অপেক্ষা বিশদভাবে আঁকিয়াছেন? যে ভারতচন্দ্রের নামে সেকেলে সম্প্রদায়ের লাল পড়ে, তাঁহার বিখ্যাত কাব্যে পড়িয়াছি বটে—'পাঁচপুত্র নৃপতির সবে যুবজানি।' কিন্তু এই যুবতী বধূদিগের যাএ যাএ কিরূপ সদ্ভাব ছিল, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি কিরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল, শ্বশ্রূঠাকুরাণীরই বা তাঁহাদিগের উপর কিরূপ স্নেহ-মমতা ছিল, রায়গুণাকর তৎসম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিয়াছেন কি? প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন,—ইঁহারা অপ্রধানা পাত্রী, ইঁহাদিগের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিবৃত করা কবির উদ্দেশ্য নহে। একথা না হয় মানিলাম। কিন্তু নায়িকা 'বিদ্যা' যখন বহুদিন পিত্রালয়ে বাস করার পর শ্বশুরের ঘর করিতে গেলেন, তখন তিনি কি প্রণালীতে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা করিতে লাগিলেন, এবং শ্বশুর-শ্বাশুড়ীই বা পুত্রবধূকে কিরূপ স্নেহ করিলেন, কবি তাহার কোন বিবরণ দিয়াছেন কি?

'রাজারাণী তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা।'

ইহাতেই কি আমরাও তুষ্ট হইয়া দ্বিজ-ভারত-বর্ণিত 'মহোৎসবে' মগ্ন থাকিব ?

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে বৌ-বেটা বরণ করিয়া ঘরে তোলার কথা স্থানে স্থানে আছে বটে, কিন্তু তাহার পরে শ্বাশুড়ী-বৌএ একত্র ঘর করার চিত্র কৈ ? লহনা-খুল্লনা সপত্নীদ্বয়ের শ্বাশুড়ীর বালাই নাই। সপত্নী-শঙ্কায় লহনা বলিতেছেন, 'একলা ঘরের দারা, আছিলাম স্বতন্তরা, নিতে দিতে আপনি গৃহিনী।' লহনার সখী লীলাবতী ব্রাহ্মণী গর্ব্ব করিয়া বলিতেছেন, 'শ্বাশুড়ী ননদী, ঔষধে ত বান্ধি, আমার বচন ধরে।' কেবল কালকেতু ব্যাধের ঘরে দেখা যায় শ্বাশুড়ী বধূকে লইয়া বড় সুখে আছেন—

'নিদয়ার বাক্য ধরে ফুল্লরা রন্ধন করে
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন।
খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ ক্ষীরখণ্ড দধিমধু
নিদয়ার সফল জীবন।'

তবে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কিছুদিন পরেই কাশীবাস করিলেন; বধূ একবার মাথাখাড়া দিলে তাঁহাদিগের এ সুখ বরাবর থাকিত কি না, জানি না।

মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে চাঁদ সদাগর ও সাহে সদাগরের ঘরে অনেকগুলি পুত্রবধূ ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও যাএ যাএ সদ্ভাব ও শ্বাশুড়ী-বৌএ সদ্ভাবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে কি ? সোনেকা পুত্রশোকে বেহুলাকে অকথা কুকথা বলিয়াছেন; অবশ্য সে শোকের অবস্থায় তাহা মার্জ্জনীয়। শোক সামলাইয়া 'সোনা বলে বধূ তুমি আমার কথা রাখ। লখাইর বদলে মোরে মা বলিয়া ডাক।' কথা কয়টি বড় করুণ, বড় মধুর। সীতা-সাবিত্রী-দ্রৌপদীর ন্যায় বেহুলার শ্বশ্রূভক্তিও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে 'শাশুড়ী-ননন্দ, কিবা কৈল মন্দ' ও

'শাশুড়ী ননদী নাহি, নাহি তোর সতা
কা'র সনে দ্বন্দ্ব কর‍্যা চক্ষু কৈলি রাতা।'

এবং কলির দোষকীর্ত্তনে 'বধূজন হবে বলী, শাশুড়ীর ধরি চুলি, শ্বশুরে করিবে অপমান', ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'সতীনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিণী, ননদী নাগিনী, বিষের ভরা' এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে জটিলা-কুটিলা, শাশুড়ী-বৌএর ও ননদ-ভাজের অপ্রণয়ের পূর্ণপরিচয় দিতেছে। অন্নদা-মঙ্গলে রতি, সতী, পার্ব্বতী কাহারও শাশুড়ী-ননদ নাই। হরিহোড়ের বৃদ্ধ মাবাপের প্রতি ভক্তির পরিচয় পাই, কিন্তু হরিহোড়ের পত্নীগণের শ্বশ্রূসেবার পরিচয় কৈ পাই? ভবানন্দ মজুমদারের চন্দ্রমুখী-পদ্মমুখীরও ত ঠিক সেই অবস্থা। কেবল শাপমোচন-কালে 'চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানা ছান্দে। শ্বশুর-শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে॥' বলিয়া কবি শেষরক্ষা করিয়াছেন।

মেয়েলি ছড়ায় ও ব্রতকথায় 'গুণবতী বৌ চান' 'বৌ-রান্না. ভাত খেয়ে চাঁদপানা মু চান', ও 'কৌশল্যা শাশুড়ী পাব, দশরথ শ্বশুর পাব, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব' প্রভৃতি সাধ আছে, কিন্তু এ সাধ পূর্ণ হইবার কোনও সংবাদ সেগুলিতেও পাওয়া যায় না। (এগুলিতে যা সম্বন্ধে কোনও. সাধ দেখা যায় না, ইহাও আশ্চর্য্য নহে কি?) বরং দুই একটী ব্রতকথায় শাশুড়ী বধূকে ব্রতপালনে বাধা দিতেছেন, ধমকচমকও লাগাইতেছেন— কিন্তু শেষে সুশীলা বধূর গুণে শ্বশ্রূর প্রেতাত্মার সদ্গতি হইতেছে, এরূপ বিবরণ আছে। যমপুকুর ব্রতে উদ্ধবের মাএর কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। পক্ষান্তরে শীতলাষষ্ঠীর ও মনসাপূজার কথায় স্নেহময়ী শাশুড়ী ও ভক্তিমতী বধূর চিত্র এবং মনসাপূজার কথায় বেণেগৃহস্থের ঘরে সাত মাএর সদ্ভাব-সম্প্রীতির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, দেখা যায়। অনেক

রূপকথায় বধূর প্রতি শ্বাশুড়ীর নিষ্ঠুরতার উদাহরণ মিলে। মেয়েলি ছড়ায় 'উড়কি ধানের মুড়কি দিব শ্বাশুড়ী ভুলাতে' এই শেষছত্র দেখিলেই বিদিত হওয়া যায়, 'শ্বাশুড়ী কিসে ভুলিবে—এই পরম দুশ্চিন্তা তখনও সম্পূর্ণ ছিল।' (৮) 'কলাবৌকে জ্বালা দিও না গণেশের মা' (৯) প্রচলিত এই গানে মানুষের ছাঁচে গড়া দেবতার মধ্যেও বৌকাঁটকী শ্বাশুড়ীর খবর পাওয়া যায়!

সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্য।

এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের সম-সাময়িক বা ঈষৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, নাটককার ও আখ্যায়িকাকারদিগের রচনার ভিতর সন্ধান করিয়া দেখা যাউক, তাঁহাদিগের তুলিকায় এই শ্রেণীর চিত্র কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে।

প্রথমেই বাঙ্গালার শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি ৺ঈশ্বরগুপ্তের কথা মনে আসে। তাঁহার 'পৌষপার্ব্বণে' 'শ্বাশুড়ী-ননদ কত কথা কয় বেঁকে' হইতে সুধামুখী শ্বাশুড়ী-ননদের কথা এবং মুখরা মেঝবৌ শ্বাশুড়ী-ননদীর নামে স্বামিসকাশে চুকুলি কাটিতেছে, ইহা হইতে সুশীলা বধূর কথাও বেশ জাহির হইয়াছে। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকে ও 'নবনাটকে' 'শ্বাশুড়ী রায়বাঘিনী'র কথা আছে।

মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের কথা পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি। তাহাতে শ্বাশুড়ী, বধূকে ও সঙ্গে সঙ্গে কন্যাকেও গৃহস্থালীর কায ফেলিয়া রাখিয়া তাস খেলার জন্য মৃদুভর্ৎসনা করিতে-

---

(৮) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ (সাধনা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০১।)

(৯) শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক জানেন 'কলা বৌ' বাস্তবিক গণেশের স্ত্রী নহেন।

ছেন, এইটুকু গিন্নী-গিরির পরিচয় পাওয়া যায়; বধূর ভক্তিমত্তা ও শ্বাশুড়ীর স্নেহবত্তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

৺দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তেও চিত্র অনেকটা এই প্রকারের। 'লীলাবতী'তে হেমচাঁদের মাতা ও নদেরচাঁদের মাতা বধূকে নদেরচাঁদের সঙ্গে কথা না কহাতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছেন, দেখা যায়। 'জামাইবারিকে' শ্বাশুড়ী-বৌএ ও যাএ যাএ পরস্পর কিরূপ ব্যবহার তাহা জানা যায় না। 'নবীন তপস্বিনী'তে শ্বাশুড়ী ও সপত্নীকর্ত্তৃক বড়রাণীর রীতিমত নির্য্যাতনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তবে বড়রাণী (তপস্বিনী) ও তাঁহার ভবিষ্যৎ পুত্রবধূ (কামিনী)—এতদুভয়ের মধুর স্নেহ-সম্পর্ক হইবে তাহার আঁচ পাওয়া যায়। 'কমলে কামিনী'তে শিখণ্ডিবাহনের পালয়িত্রী মাতা ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর মনের ভাবও কতকটা এইরূপ। বধূ রণকল্যাণীরও শ্বশ্রূভক্তি অকপট। তবে নাটকখানি নায়ক-নায়িকার শুভবিবাহেই প্রায় শেষ হইয়াছে। ৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকে শ্বাশুড়ী-বৌএর একত্র ঘরকরনার চিত্র নাই, তবে শ্বাশুড়ী মাএর মত যত্ন করিয়া বালিকাবধূকে লালন-পালন করিয়াছিলেন, বধূ একস্থলে এই কথা বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রায় সকল নাটকে যাএর সমাগম নাই; প্রধান অপ্রধান প্রায় সকল পাত্রই এক মাএর এক ছেলে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণালী অন্য সকলের প্রণালী হইতে বিভিন্ন নহে। কেবল ৺দীনবন্ধু মিত্রের একখানি নাটকে— 'নীলদর্পণে' শ্বাশুড়ী-বৌএ ও যাএ যাএ (এবং ভাইএ ভাইএ) যে উজ্জ্বল-মধুর স্নেহসম্পর্কের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে চক্ষুঃ জুড়ায়। ইহা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। 'নীলদর্পণে'র বহুবৎসর পরে রচিত ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকে ঠিক একই প্রকার উজ্জ্বল-মধুর চিত্র

অঙ্কিত হইয়াছে দেখা যায়। পক্ষান্তরে ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য় সরলার করুণ কাহিনীতে ও মধুর চরিত্রে যেমন আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়, তেমনই প্রমদার কদর্য্য ব্যবহারে যাএ অরুচি জন্মিয়া যায়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ'এ মেজবউ প্রমদার (১০) চরিত্র অতি সুন্দর, কিন্তু তাঁহার শাশুড়ী ও যা—এ-বলে আমারে দেখ, ও-বলে আমারে দেখ!

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর করের 'অনাথ বালকে' মোক্ষদার শাশুড়ী 'রায়-বাঘিনী', তাঁহার অত্যাচারে বধূর স্বাস্থ্যভঙ্গ ও পরে অচিকিৎসায় অকাল-মৃত্যু ঘটিল। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'লজ্জাবতী' গল্পের শাশুড়ীও এই গোত্রের।

তাহা হইলে দেখা গেল, সমসাময়িক সাহিত্যে এক 'নীলদর্পণ' (ও তাহার বহু পরে রচিত) 'প্রফুল্ল' ব্যতীত আর কোথাও শাশুড়ী-বৌএর সদ্ভাবের পূর্ণায়তন চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। অতএব ননদ-ভাজের ন্যায় এক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্যম প্রশংসাযোগ্য, এবং তাঁহার পরমসুহৃদ্ মিত্র মহাশয়ের 'নীলদর্পণে'র কথা ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার মৌলিকতাও অসাধারণ বলিতে হইবে।

বাঙ্গালী-জীবনে শাশুড়ী-বৌএর অসদ্ভাব-অসম্প্রীতি বহু স্থলে পরিদৃষ্ট হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী-জীবনের কুৎসিত দিক্‌টা না দেখাইয়া সুন্দর দিক্‌টাই বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। অতএব ননদ-ভাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, এক্ষেত্রেও তাহা বলিতে পারি—বঙ্কিমচন্দ্র (ও দীনবন্ধু) অনন্য-সাধারণ কল্পনাবলে, বাঙ্গালী জাতির কল্যাণকামনায়, নূতন আদর্শে

---

(১০) 'প্রমদা' নামটির দোষ খণ্ডাইবার জন্যই কি 'স্বর্ণলতা'য় বর্ণিত ঘোর স্বার্থ-পরায়ণা প্রমদার নামে শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শবধূর নামকরণ?

সমাজগঠন-চেষ্টায়, বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে ননদ-ভাজের ন্যায় শাশুড়ী-বৌএরও স্নেহবন্ধন ঘটাইয়াছেন—ইহা কি কম কৃতিত্ব ?

সংস্কৃত সাহিত্য।

ইংরেজীশিক্ষার হিড়িকে ও ইংরেজী সমাজগত ও সাহিত্য-গত আদর্শের নকলের দাপটে আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছি, প্রতিপক্ষগণ এ আক্ষেপও করিয়া থাকেন। তাঁহারা কথায় কথায় সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতির কথা তুলিয়া সূর্য্যমুখী ভ্রমর শৈবলিনী প্রভৃতির সহিত তুলনায় সমালোচনা করিতে বসেন। সে কথার বিচারের এ স্থল নহে। তবে দেখা যাউক, সংস্কৃত-সাহিত্যে শাশুড়ী-বৌএর ও যাএর কিরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

বক্তব্য-জ্ঞাপনের সুবিধার জন্য, সংস্কৃত-ভাষায় রচিত আখ্যানগুলির দুইটি বিভাগ ধরিয়া লইতে পারি। প্রথম—রামায়ণ মহাভারত পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত উপাখ্যান। দ্বিতীয়—মহাকাব্য খণ্ডকাব্য দৃশ্যকাব্য কথা আখ্যায়িকা প্রভৃতি। ইহার প্রথম শ্রেণীর সহিত 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতির তুলনা, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর পরস্পরের সহিত তুলনা। সংস্কৃত-সাহিত্যের কথা ও আখ্যায়িকাই (এবং নাটক) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষা'দির সহিত—তথা ইংরেজী নভেল ও রোম্যান্সের (এবং ড্রামার) সহিত—তুলনীয়। এই সামান্য কথাটা অনেকে ভুলিয়া গিয়া বিষম অনর্থ ঘটান; সেই জন্য কথাটা এখানে বলিয়া রাখিলাম।

যাহা হউক, রামায়ণ-মহাভারতাদিতে বর্ণিত উপাখ্যান সম্বন্ধেও এক্ষেত্রে দুই চারিটি কথা বলিবার আছে। রামায়ণে সীতা উর্ম্মিলা মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তি পরস্পরের যা ও ভগিনী, খুবই সদ্ভাবে থাকিবার কথা। কিন্তু আর্ষ রামায়ণে ইহার কোনও প্রসঙ্গ আছে কি? মন্দোদরী ও সরমা

ভুই যাএ কেমন ভাব ছিল, মন্দোদরী ও ইন্দ্রজিৎপত্নীর শ্বশ্রূবধূসম্পর্ক কিরূপ ছিল, ইহা জানার কোন উপায় আছে কি? কৌশল্যাদি শ্বশ্রূগণ সীতাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন, তাহার সন্ধানও সবিশেষ পাওয়া যায় কি? রামায়ণ পড়িতে পড়িতে কত সময় মনে হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র যখন দুর্ব্বহগর্ভখিন্না জনকনন্দিনীকে নির্ব্বাসনদণ্ড দিলেন, তখন কৌশল্যা-দেবী সেই অপূর্ব্ব-কর্ম্মচাণ্ডালের নিকট একটা উপদেশ উপরোধ অনুরোধ অনুযোগ করিয়া মাতার কর্ত্তব্য—শ্বশ্রূর কর্ত্তব্য—পালন করিলেন না কেন? করুণরসের কবি ভবভূতির বোধ হয় এ কথাটা মনে লাগিয়াছিল, তাই তিনি রাজমাতা কৌশল্যাদিকে জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞদর্শনে পাঠাইয়া সাফাই (alibi) দিয়াছেন; এবং সীতা-নির্ব্বাসনের অনেকদিন পরে, বাল্মীকির আশ্রমে কৌশল্যাকে আনিয়া তিনি যে নির্ব্বাসিতা সীতার জন্য কাতর,—এ দৃশ্যও দেখাইয়াছেন। ইহা তবু মন্দের ভাল। সীতাদেবী শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা না করিয়া, এবং তাঁহাদিগের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, স্বামির সঙ্গে বনগমন করিলেন, এখানেও ত ঠিক হিন্দুবধূর কর্ত্তব্য-পালন হইল না,—এ কুতর্কও যে তোলা যায় না, এমন নহে। (১১) কেন না হিন্দুস্ত্রীর সম্পর্ক শুধু স্বামীর সঙ্গে নহে—সমস্ত পরিবারের সঙ্গে। যাহা হউক, সীতা শ্বশ্রূদিগের প্রতি যে প্রকৃত ভক্তিমতী ছিলেন, ঋষিকবি নিতান্ত সংক্ষেপে সারিলেও চিত্রের সে অংশটুকু বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, সীতা শুধু আদর্শপত্নী ও আদর্শসতী নহেন, তিনি আদর্শবধূও।

---

(১১) কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, সীতা আধুনিক কুলবধূদিগের মত শ্বাশুড়ীকে ছাটিয়া ফেলিয়া স্বামীর কর্ম্মস্থলে সুখসম্ভোগ করিতে যাইতেছেন না; স্বামীর সঙ্গে চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বনবাস-ক্লেশ ভোগ করিতে যাইতেছেন। এরূপ বিপৎকালে তাঁহার পক্ষে মহাগুরু স্বামীর সেবাই প্রশস্ত ধর্ম্ম। নতুবা ত বলিতে হয়, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা ছাড়িয়া স্বামীর সহমরণেও পত্নীর অধিকার নাই!

মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র ; এই শত পুত্রবধূ কুরুপুরীতে কিরূপ সদ্ভাবে বাস করিতেন, গান্ধারীর সহিতই বা তাঁহাদিগের কিরূপ স্নেহ-সম্পর্ক ছিল, অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতে তাহার বিশদ বর্ণনা আছে কি ? কুরুকুল সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, যদুকুল সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যায়। "যা' নাই ভারতে তা' নাই ভারতে"—এ কথা অবশ্য মিথ্যা নহে। সেই জন্য দেখি, দ্রৌপদী কিরূপে কুন্তীর সেবা করিতেন, একথা মহাভারতে দুইটি স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। (আদিপর্ব্ব ১৯২ অধ্যায় ও বনপর্ব্ব ২৩২ অধ্যায়—দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ।) সাবিত্রীর শ্বশুর-শ্বশ্রূভক্তিও সুপ্রসিদ্ধ। রামায়ণের সীতার ন্যায়, সাবিত্রী ও দ্রৌপদী শুধু আদর্শপত্নী ও আদর্শসতী নহেন, আদর্শ-বধূও। কুন্তীকেও আদর্শ শ্বশ্রূ বলা যায়। দ্রৌপদীও সীতার ন্যায় পতিসঙ্গিনী হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছায় নহে—যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় নির্জ্জিত হইয়া সস্ত্রীক ও সভ্রাতৃক বনে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, সে ক্ষেত্রেও দ্রৌপদী ভক্তিভরে শ্বশ্রূ কুন্তীর নিকট পতিগণের অনুগমনে অনুমতি লইয়াছিলেন এবং কুন্তীও সস্নেহ ব্যবহারে তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। (সভাপর্ব্ব ৭৭ অধ্যায়।)

তাহা হইলে দেখা গেল, রামায়ণ-মহাভারতাদিতে সীতা বা দ্রৌপদী বা সাবিত্রীর শ্বশ্রূভক্তির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকিলেও, শ্বাশুড়ী-বৌএর ও যাএ যাএ একত্র ঘরকরনার পূর্ণায়তন চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। অবশ্য ইহার প্রকৃত কারণ, রামায়ণ মহাভারত শাস্ত্রগ্রন্থ—সুতরাং পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এ গুলিতে প্রদর্শিত হইতে পারে না।

কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লৌকিক সাহিত্যের (Secular literature) কথা জোর করিয়া তুলিতে পারি। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাঘব-পাণ্ডবীয়, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত প্রভৃতি মহাকাব্যে, কাদম্বরী,

বাসবদত্তা, হর্ষচরিত, দশকুমারচরিত প্রভৃতি কথা ও আখ্যায়িকায়, রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, নাগানন্দ প্রভৃতি নাটক-নাটিকা-ত্রোটক-প্রকরণে, শকুন্তলা, পঞ্চরাত্র, বেণীসংহার, ধনঞ্জয়বিজয় প্রভৃতি মহাভারতাশ্রিত নাটকে, অনর্ঘরাঘব, চণ্ডকৌশিক, মহানাটক, বীরচরিত, উত্তরচরিত (১২) প্রভৃতি রামায়ণাশ্রিত নাটকে, শ্বাশুড়ী-বৌএর স্নেহসম্পর্ক ও যাএ যাএ প্রীতিবন্ধনের চিত্র সম্যক্ অঙ্কিত হইয়াছে কি ?

এসকল কাব্যেও অনেক স্থলে নায়ক একলা-মাএর একলা-ছেলে, উদ্‌বাহবন্ধনে অথবা পুনর্ম্মেলনে আখ্যানের পরিসমাপ্তি, নায়িকার বিবাহিত-জীবনে শ্বশ্রূ অদৃশ্য বা অনুল্লিখিত, নায়কনায়িকা প্রণয়মিলনে ব্যস্ত বা বিরহ-ব্যথায় কাতর—ইত্যাদি নভেলী ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয় না কি ? শকুন্তলা, স্বামি-গৃহে যাইবার সময়, গুরুজনদিগকে শুশ্রূষা করিবার উপদেশ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সে উপদেশ প্রতিপালন করিবার সুযোগ নাটকের অন্তর্ভুক্ত অঙ্কসমষ্টির মধ্যে পাইয়াছেন কি ? এখানেও কি দেখি না, 'মৃণালিনী,' 'ইন্দিরা' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র ন্যায় পুনর্ম্মেলনেই পরিসমাপ্তি ? তবে কি বলিব, কালিদাসাদি মহাকবিগণ পারিবারিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত না করিয়া বিকৃত আদর্শ প্রচার করিয়াছেন ? তাহা যদি না হয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ কোথায় ? আমরা কোন্ মুখে বলিব, তিনি আমাদের সাহিত্যের সনাতনী ধারা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন ?

(১২) উত্তরচরিতে ভবভূতির কৃতিত্বের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রঘুবংশে কৌশল্যা ও সীতার স্নেহসম্পর্ক বধূবরণকালে বা বনগমনকালে বা সীতার গৃহবাসকালে বা সীতানির্ব্বাসন-ব্যাপারে বা সীতার পাতালপ্রবেশ-কালে চিত্রিত হয় নাই। কেবল স্বামীর সহিত চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসের পর সীতা গৃহে ফিরিলে শ্বাশুড়ী-বৌএ প্রথম আলাপের সুন্দর একটি চিত্র চতুর্দ্দশ সর্গে অঙ্কিত হইয়াছে। আর ঐ সর্গে নির্ব্বাসিতা সীতা, লক্ষ্মণকে বিদায় দিবার কালে, শ্বশ্রূদিগকে ভক্তি জানাইয়াছেন।

শেষ কথা।

প্রতিকূল সমালোচকগণ হয়ত প্রাচীন সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বহুতর নজির দেখিয়াও নিরুত্তর হইবেন না। অধিকন্তু বর্ত্তমান লেখক নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তি, তিনি সমালোচনাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অব্যবসায়ী, সুতরাং গোঁজামিল দিতেছেন বলিয়া, উপহাস করিবেন ও উপেক্ষার তীখিনি বাণ ঝাড়িবেন। তাঁহারা যে গোড়ার কথাটা ধরিয়া রাখিয়াছেন, সেইটাই পুনঃ পুনঃ প্রচার করিবেন; এমন কি, ঝোঁকের মাথায়, গৃহলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী, লক্ষ্মী বৌ, লক্ষ্মী মা, লক্ষ্মী মেয়ে, ঠাকুর মা, প্রভৃতি পুস্তককেও অম্লানবদনে 'কপালকুণ্ডলা,' 'বিষবৃক্ষ,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বসিবেন! এ কথা বলিয়া তাঁহারা যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্য একত্র তুলিত করিতেছেন, তাহা ভুলিয়া যান। অতএব, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যাহা প্রকৃত কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা আরও একটু খোলসা করিয়া বলি। মীমাংসার ভার সুধীবর্গের উপর।

বঙ্কিমচন্দ্র, কালিদাস-ভবভূতির ন্যায়, সুবন্ধু-বাণভট্টের ন্যায়, আর না হয় স্বীকারই করিলাম, ওয়াল্‌টার্ স্কট্ বুল্‌ওয়ার্ লিটনের ন্যায়, কল্পনার কল্পলোকে বিচরণ করিয়া জ্যোৎস্নালোকিত কুসুম-সুকুমার রোম্যান্স-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জগতের প্রেমরাজ্যের মধুরমোহন স্বরূপ বিকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন পুঁথি 'মধুমালতী' উপাখ্যানের শেষে কবি বলিতেছেন,—"পীরিত-বর্ণন গ্রন্থ কৈল সমাপন। শুনিলে রসিকজনের রসে ভরে মন॥" এই দুই ছত্র এই শ্রেণীর সকল কাব্যসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। এই প্রণয়ব্যাপারকে পায়রার বক্‌-বকম্ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ইহা ভগবৎশক্তির প্রেরণা,

জীবজগতের অনন্ত অনিন্দ্য রহস্য। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে যে শক্তির প্রভাবে 'প্রিয়ামুখং কিংপুরুষশ্চুচুম্বে' অথবা 'মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ', নরলোকেও সেই শক্তির প্রভাবে নল-দময়ন্তীর, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার, চারুদত্ত-বসন্তসেনার, অন্যোন্যানুরাগ। অন্যে পরে কা কথা, রাধাকৃষ্ণের বা হরগৌরীর বিচিত্র প্রেমলীলায়ও এই রহস্য অন্তর্গূঢ়। ইহা শাশ্বত, সত্য ও সুন্দর। তাই, পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ন্যায়, কল্পনাদৃষ্টি তাঁহারও অবলম্বন, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি তাঁহারও অভিলাষ। সেই জন্য তাঁহার আখ্যায়িকাবলির আকাশ ও বাতাস (Atmosphere) ও পরীবেষ (environment) 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী করা'। ইহা পরীরাজ্যের ন্যায় সুন্দর এবং পরীরাজ্যের ন্যায়ই অপূর্ব্ব, অসাধারণ, অলৌকিক ; ইহাকে 'অস্বাভাবিক' বলিলে নিজেরই রসগ্রহণে অসমর্থতা স্বীকার করা হয়।

বাস্তবজীবনের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করা, যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং করা, তাঁহার প্রতিভার প্রিয় পদার্থ ছিল না। 'গার্হস্থ্য উপন্যাস' লেখাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। তাঁহার লক্ষ্য Idealism,—Realism নহে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলালে' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বা 'সধবার একাদশী'তে বা 'স্বর্ণলতা'য় বা 'মেজবউ'এ গার্হস্থ্য জীবনের যে কঠোর বাস্তবতা আছে, এই শ্রেণীর আখ্যায়িকায় তাহার স্থান হইতে পারে না। পারিবারিক জীবনের সকল দিক্ সম্পূর্ণভাবে অঙ্কিত হইবে, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, সন্তানস্নেহ, সৌভ্রাত্র, প্রভৃতি সম্পর্কের পূর্ণায়তন চিত্র থাকিবে, ইহা কখনও এই শ্রেণীর কাব্যে আশা করা যাইতে পারে না। প্রেমকাহিনীই এই শ্রেণীর কাব্যে অধিক স্থান যুড়িয়া থাকিবে, অন্য অবান্তর বিষয় সংক্ষেপে থাকিবে। এ অবস্থায়ও যে কবি ননদ-ভাজ, দুই ভগিনী, শাশুড়ী-বৌ প্রভৃতি সম্পর্কের সুন্দর চিত্র স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

সত্য বটে, ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' ও ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকে গার্হস্থ্যাশ্রমের সুন্দর উজ্জ্বল মধুর পূর্ণায়তন চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু উভয়ত্রই নাটক-কার বাস্তবজীবনবর্ণনে অভিলাষী। একের উদ্দেশ্য, গোলকচন্দ্র বসুর মত সম্পন্ন-পরিবার ও সাধুচরণের মত সামান্য-গৃহস্থ-পরিবার কেমন সুখের সংসার ছিল, এবং এমন সোণার লঙ্কা নীল-বানরে কি করিয়া ছারখার করিল, তাহা প্রদর্শন করা। অপরের উদ্দেশ্য, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সহোদরের সোণার সংসারের, কিরূপে বিলাতী ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে বিকারগ্রস্ত মধ্যম ভ্রাতা রমেশচন্দ্র দ্বারা সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল, তাহাই প্রদর্শন করা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, সুতরাং বর্ণনা-প্রণালীও স্বতন্ত্র।

অবশ্য, রোম্যান্সে নায়ক-নায়িকার চিত্র ফুটাইবার জন্য, পারিপার্শ্বিক হিসাবে অন্যান্য, অপ্রধান, চরিত্রের সমাবেশ থাকিতে পারে। কিন্তু সেগুলি মূল-প্রতিমার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে—সাজ বা চালচিত্তির মাত্র। দিলে ক্ষতি নাই, না দিলেও দোষ নাই। সেই জন্যই দেখি, বঙ্কিমচন্দ্র ননদ-ভাজে বা বোনে বোনে সখিত্ববন্ধনের বা শাশুড়ী-বৌএ প্রীতি-সম্পর্কের যে সকল চিত্র তাঁহার চিত্রশালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, সেগুলি তিনি নায়ক-নায়িকার প্রণয়কাহিনীর পারিপার্শ্বিক চিত্র হিসাবেই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, 'গার্হস্থ্য উপন্যাসে'র প্রণালীতে বিবৃত করেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বাস্তবজীবনের কোন কোন অংশ চিত্র-শালার অন্তর্নিবিষ্ট করিবারও প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা জানিতেন এবং তিনি তদনুসারে বাস্তবজীবন হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যেখানে যতটুকু ব্যবহার করিলে সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা ঘটে, বা বাস্তবতা (Realism) ও কাল্পনিকতা (Idealism) এতদুভয়ের (Contrast) বিরোধিতায় সৌন্দর্য্য ফুটে, তিনি ঠিক তাহাই করিয়াছেন।

তিনি সাধারণতঃ বাস্তবজীবনের অসুন্দর ও অশোভন অংশ পরিহার করিয়াছেন, কেবল যেখানে আখ্যানবস্তুর বিবর্ত্তনে (evolution of the plot) এরূপ অপ্রিয় বস্তুর অবতারণার উপযোগিতা আছে, সেইখানেই তাহা দেখাইয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থকার এই উভয় প্রকার উপকরণের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গিয়া এক শ্রেণীর কিম্ভূত-কিমাকার 'গার্হস্থ্য উপন্যাস' সৃষ্টি করিতেছেন। সেগুলিতে আর্ট-রূপ গব্যঘৃতের সম্পূর্ণ অভাব, উপদেশ (lecturing, preaching, sermonising) প্রভৃতি কাঁকরের বাহুল্য; সুতরাং এই মিশ্রণে দেবভোগ্য খিচুড়ি না হইয়া রোগীর পথ্য 'ওগড়া'য় দাঁড়াইতেছে। এই সকল গ্রন্থকারের সঙ্গে তুলনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রকৃতি বুঝা যায়।

মূল কথা, 'গার্হস্থ্য উপন্যাস' লেখা বা বাস্তবজীবনের চিত্র অঙ্কিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। হইতে পারে, রূপকথার রাজপুত্রের ন্যায়, ভারতচন্দ্রের সুন্দরের ন্যায়, 'শকুন্তলা'র নায়ক দুষ্যন্তের ন্যায়, কপাল-কুণ্ডলার নায়ক নবকুমারেরও জননী ছিলেন—হইতে পারে কেন, বাস্তবিকই ছিলেন—কিন্তু, আখ্যান-বর্ণনে তাঁহার স্থান নিতান্ত অল্প। ইহাতে পূজ্যপূজাব্যতিক্রম ঘটে নাই। সর্ব্বত্রই কবিগণ নায়ক-নায়িকাকে লইয়া ব্যস্ত; কিরূপে রাজপুত্রের কেশবতী রাজকন্যার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে, কিরূপে সুন্দরের বিদ্যালাভ হয়, কিরূপে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে লাভ করিতে পারেন, কিরূপে নবকুমার কপালকুণ্ডলার প্রেমলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন, কবির কেবল সেই ভাবনা। এই শ্রেণীর কাব্যে নায়কনায়িকার 'পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান, অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন' প্রভৃতি প্রণয়ব্যাপারই বর্ণনীয় বিষয়। কবিকুল চিরকালই এই রসের রসিক, অধিকাংশ কাব্যে ইহাই স্থায়িভাব। ইহা দেববাণীর অমৃতনিস্যন্দিনী মন্দাকিনী—বিলাতী বন্যার 'লোনাপানি' নহে। বঙ্কিম-

চন্দ্রের উপর মিছামিছি ঝাল ঝাড়িলে চলিবে কেন? তিনি তাঁহার আখ্যায়িকাবলিতে প্রেমকে প্রাধান্য দিয়া পূর্ব্বসূরিগণের পদবী অনুসরণ করিয়াছেন, 'একটা নূতন-কিছু' করেন নাই।

নিরন্তর মিষ্ট-ভক্ষণে মুখ মারিয়া আসে। অধিক অমৃতপানেও নাকি অরুচি ঘটে। তাই আরব্যোপন্যাসের উজ্জ্বল আলোকচিত্র, পরীরাজ্যের স্বপ্নের ফুল, দেখিয়া দেখিয়া কাঙ্গালী বাঙ্গালীর চোখ ঝলসিয়া গিয়াছে। জীবনসংগ্রামের কঠোর পীড়নে, সুকুমার কাব্যপ্রিয়তা, নিরবচ্ছিন্ন ভাবপ্রবণতা, কমলবিলাসীর ভাবের নেশা, আর বাঙ্গালীর ধাতে সহিতেছে না। সুতরাং আমাদের রুচি বদলাইয়াছে, কবিকল্পনা-রূপা কামধেনুর প্রদত্ত ক্ষীর-সর-নবনীত ছাড়িয়া হেঁশেলের ভিজা-ভাত বেগুন-পোড়ায় মন বসিয়াছে। ইহার দারুণ আজকাল বাঙ্গালী লেখকেরা, কল্পনার আসমানি লোক ছাড়িয়া, বাস্তবজীবনের সুখ-দুঃখ-বর্ণনা করিতে ব্রতী হইয়াছেন। Idealismএর protest স্বরূপ Realismএর উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহারা, বিলাতী কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা বিলাতী আখ্যায়িকা-কার ডিক্‌ন্‌সের ন্যায়, সাধারণ বাস্তবজীবনেও যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পাওয়া যায়, তাহা দেখাইতেছেন। (বিজ্ঞ সমালোচকগণ বলিবেন, ইংরেজীর নেশা কাটিয়াছে, আমরা এখন শাদা চোখে দেখিতে সুরু করিয়াছি।) তাই আমরা 'অনাথবন্ধু' 'অনাথ বালক', 'সুরবালা' 'ধ্রুব-তারা', 'প্রেমের জয়', 'নাগপাশ', 'অদৃষ্টচক্র' প্রভৃতি গ্রন্থে একান্নবর্ত্তী পরিবারের পূর্ণায়তন চিত্র দেখিতেছি—অনেক ছোট-বড়-মাঝারী গল্পে শ্বাশুড়ীর, বৌএর, যাএর, ননদের, ভাজের, সুন্দর অসুন্দর শত শত 'ফোটো' দেখিতেছি। ইহা আহ্লাদের কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দ্রজালে বিমুগ্ধ হইয়াও এ কথা অকপটে বলিব যে, আমি নিজে এই শ্রেণীর

গল্পের গোঁড়া। কিন্তু তাই বলিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতির আখ্যায়িকার অন্যায় নিন্দা করিলে চলিবে কেন? বিকসিত চূতমুকুলে কাঁঠালকোষের অস্তিত্বসম্ভাবনা নাই বলিয়া কি তাহা উপভোগ্য নহে?

এ সম্বন্ধে যথাজ্ঞান আলোচনা করিলাম। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ্রযশে মসীবিলেপন করেন, জানি না তাঁহারা এই ক্ষীণ চেষ্টাকে 'বিফল-প্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ' ভাবিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিবেন কি না? আর যদি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-প্রতিবিম্বিত কাব্য-সরোবরের পঙ্কোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, যদি প্রতিকূল-সমালোচনা-রূপ রাহুগ্রাস হইতে বঙ্কিম-চন্দ্রকে মুক্ত করিতে পারিয়া থাকি, তবে সে বঙ্কিমচন্দ্রেরই গুণে, তাহাতে এই ক্ষুদ্র লেখকের কোন কৃতিত্ব নাই।

পরিশিষ্ট।

একান্নবর্ত্তী পরিবার। *

আলোচনা।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখদুঃখের কথা আমরা অনেকেই অল্পবিস্তর জানি—কেন না আমরা অনেকেই ভুক্তভোগী। সম্প্রতি, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে শ্বাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক কি ভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিতে গিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা নূতন করিয়া মনে উদয় হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানবুদ্ধিতে যেটুকু আসিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। সমাজতত্ত্ব বড় জটিল ব্যাপার, সব কথা যে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিয়াছি, এরূপ বিবেচনা করি না।

একান্নবর্ত্তী পরিবার শুধু শ্বাশুড়ী ও তাঁহার এক বা একাধিক বৌকে লইয়া নহে—বধূগণের জ্যেঠশ্বাশুড়ী খুড়শ্বাশুড়ী, অথবা মামীশ্বাশুড়ী, কোন কোন ক্ষেত্রে মাসশ্বাশুড়ী বা পিসশ্বাশুড়ী ননদ প্রভৃতি সম্পর্কীয়াগণ বৃহৎ পরিবারে বিরাজ করেন। ফাউ-স্বরূপ তাঁহাদিগের পুত্র কন্যা পুত্রবধূ জামাতা প্রভৃতিও সেই সঙ্গে আছেন। তবে আজকালকার দিনে এরূপ বৃহৎ গোষ্ঠীর একত্র অবস্থিতি প্রায় দেখা যায় না। সেই জন্য মুখ্য কয়েকটি সম্পর্কের কথাই বলিব।

আবার, একান্নবর্ত্তী পরিবার কেবল নারীপুরী নহে—স্বামী, শ্বশুর, ভাশুর, দেবর, জ্যেঠশ্বশুর, খুড়শ্বশুর, অথবা মামাশ্বশুর, কোন কোন ক্ষেত্রে

* কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত। (১৩ই বৈশাখ ১৩২১।)

মাসশ্বশুর অথবা পিসশ্বশুর, নন্দাই প্রভৃতি পুরুষগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু স্ত্রীজনের সদ্ভাব-সম্প্রীতির উপরই পারিবারিক শান্তি অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সেই জন্য তাঁহাদিগের কথাই বেশী করিয়া বলিতেছি। শাস্ত্রে আছে—

স্ত্রীপ্রধানং যতঃ প্রাহুর্গার্হস্থং পণ্ডিতাঃ খলু।

বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য, প্রারম্ভে একান্নবর্ত্তি-পরিবার-প্রথাসম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমাদের সমাজের সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজের যে সকল প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে পরিবার-গঠন-প্রণালী অন্যতম। ইউরোপীয় সমাজে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই মাতাপিতার সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। সাধারণ জীব-জগতে যে প্রাকৃতিক নিয়ম-বশে এই পরিবর্জ্জন-ক্রিয়া সংসাধিত হয়, ইউরোপীয় মানব-সমাজেও সেই নিয়ম বলবান্। ইউরোপীয় যুবক যৌননির্ব্বাচনের পর স্বতন্ত্র ঘরকরনা পাতেন, স্বামিস্ত্রী Social unit রূপে 'দুজনে একলা' থাকেন। বাপমা ভাইবোন্ সব পৃথক্—হয় ত বৎসরান্তে বড়দিনের সময় তাঁহাদিগের সহিত একবার আনন্দমিলন হয়, এই পর্য্যন্ত। শুনিয়াছি, বিলাতী বাদ্যযন্ত্র পিয়ানো বাজাইতে হইলে একজন বাজনার কল টিপিয়া বোল বাহির করেন, অন্যজন তাঁহার সমক্ষে স্বরলিপির পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া যান। বিলাতী স্বামিস্ত্রীর জীবনের সুরও ঠিক এই পিয়ানোর সুরে বাঁধা। অথবা আমাদের গ্রাম্য উপমায়, ঠিক যেন এক ঢোল আর এক কাঁসী!

বিলাতী পারিবারিক জীবন একতারার আলাপ; আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার 'বীণা সপ্তস্বরা'। যাত্রার আসরে যেমন বাঁয়াতবলা, ঢোলক, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, বীণ-বেহালা, সেতার এস্রাজ তানপুরা, প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য-যন্ত্রের বিচিত্র মিশ্রণে জমজমাট করিয়া তোলে, আমাদের পারিবারিক

জীবনও সেইরূপ মা বাপ, ভাই বোন, পুত্র কন্যা, পিসি মাসি, খুড়ী জ্যেঠী, ভ্রাতৃবধূ ভগিনীপতি, ভাইপো ভাইঝী, কোন কোন ক্ষেত্রে ভাগ্নে ভাগ্নী, ভাগ্নেবৌ ভাগ্নীজামাই, এমন কি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আত্মীয়া প্রভৃতিকে লইয়া অপূর্ব্ব জটিলতাময়। ইহা আমাদের পল্লীপ্রান্তরের বিশাল বনস্পতি বটবৃক্ষের ন্যায় বিরাট্‌কায়। এক একটি পরিবার সমগ্র সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিরূপ (Miniature)। সেই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে সমবেদনা, পরার্থপরতা, নিরপেক্ষতা, গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, স্নেহশীলতা, দয়াদাক্ষিণ্য, শ্রদ্ধাভক্তি সেবাধর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আমরা সমাজের সুবৃহৎ ক্ষেত্রে সেই শিক্ষার পরিচয় দিবার উপযোগিতা লাভ করি। হৈমন্তিক ধান্যের বীজ যেমন প্রথমে অল্পপরিসর ভূমিখণ্ডে উপ্ত হইয়া সেই স্থানেই অঙ্কুরিত হয়, পরে একটু বড় হইলে ধানের চারাগুলি সুপরিসর ক্ষেত্রে রোপিত হয়, সেইরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবারে যে সকল গুণ অঙ্কুরিত হয়, তাহা সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পুষ্পিত ফলিত হইয়া উঠে।

যাত্রার কথা যদি তুলিলাম, তবে কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া বলি ; অবশ্য যন্ত্রে সুর বাঁধিবার পূর্ব্বে একটা বিকট হট্টগোল শুনা যায়, কিন্তু সেটা আথড়াইয়ের পালা একবার জমিয়া গেলে একতান-বাদন বড়ই মধুর লাগে। সুর বাঁধিতে না পারিলে নিতান্ত বেসুরা বেথাপ্পা ঠেকে। পারিবারিক জীবনেও সর্ব্বদা বাদবিসংবাদ কলহ-কোন্দল হিংসাদ্বেষ লাগিয়া থাকিলে নিতান্ত বিসদৃশ দেখায়। কিন্তু উভয় স্থলেই অধিকারীর দোষে এই অনৈক্য ঘটে। ইহার জন্য প্রথার নিন্দা করা চলে না। জীবনসংগ্রামের কঠোরতার প্রভাবে আর তেমন গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, সঙ্গীতের আখড়া দেখা যায় না। যাঁহাদের সখের প্রাণ, তাঁহারা বড় জোর ঘরে একটা হার্ম্মোনিয়ম কিনিয়া অবসর-বিনোদন

করেন। সেইরূপ জীবনসংগ্রামের কঠোরতার প্রভাবেই কি একান্নবর্ত্তি-পরিবার-প্রথাও উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে ?

যাহা হউক, এই প্রথার জটিলতা যদিও কালধর্ম্মে ও বিলাতী সমাজের অনুকরণ-স্পৃহায় কমিয়া আসিতেছে, তথাপি ইহার ঠাটটা আজও আমাদিগের মধ্যে বজায় আছে। 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' প্রবাদবাক্যটি কতদিনের পুরাতন তাহা জানি না। রামায়ণ-মহাভারতে, শুধু সহোদর কেন, বৈমাত্রেয়গণের মধ্যেও যে সৌভ্রাত্রের আদর্শ দেখা যায়, তাহা অতি মহৎ। জানি না, ইংরেজী শিক্ষার কুহকে আমরা সেই উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছি কিনা। সব কয় ভাই যাহা রোজগার করিতেন, তাহা মাএর হাতে আনিয়া দিতেন, কেহ লুকাইয়া নিজের জন্য কিছু রাখিতেন না, মাও অপক্ষপাতে সব কয়জনের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দিতেন,—পঞ্চপাণ্ডবের আমলের এই আদর্শ বহুদিন আমাদের সমাজে চলিয়াছিল। সেকালে বাঙ্গালী সমাজে এক ভাই বিদেশে চাকরী করিতেন, অন্য ভাই দেশে বসিয়া পৈত্রিক যোতজমা দেখিতেন বা চাকরে ভ্রাতার উপার্জ্জিত অর্থে ক্রীত এসমালি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, কোন ভাই বা ঠায় বসিয়া খাইতেন, এইরূপ রীতি ছিল। কিন্তু আজকাল যে ভাইএর আয় বেশী, তিনি এ ব্যবস্থায় অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, বিশেষতঃ রোজগেরে স্বামীর স্ত্রী এ ব্যবস্থায় বিষম প্রতিবাদী হইয়া উঠেন। এখন কেহ নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত সম্পত্তি পরকে (অর্থাৎ মাএর পেটের ভাইকে) ভোগ করিতে দিতে চাহে না, বিলাতী অর্থনীতির সৎশিক্ষায় কুপোষ্যকে (অর্থাৎ নিঃস্ব আত্মীয়কে) অন্ন দিতে রাজী হয় না। মধ্যবিত্ত লোক, পৈত্রিক যা' বিঘে দুই ভুঁই ছিল, পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষা দিবার বা কন্যাদায় উদ্ধার হইবার জন্য তাহা হস্তান্তরিত করিয়া ও ছারপোকার জ্বালায় ঘরে আগুন লাগাইবার ন্যায়, ম্যালেরিয়ার জ্বালায় ভদ্রাসন বাটী বিক্রয় করিয়া,

উদরান্নের সংস্থানের জন্য সহরবাসী হইতেছে—সুতরাং যে যার আপন আপন গুছাইয়া লইতে ব্যস্ত। এ ক্ষেত্রে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হওয়া ভিন্ন উপায় কি ? সকলেই

পতঙ্গপালের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অবিরত
স্বকার্য্য সাধনে রত কেবা ভাবে কাহারে ?

এ ক্ষেত্রে 'কলির বৌ ঘরভাঙ্গানী' বলিয়া সকল দোষ তাঁহাদের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না।

ফলতঃ, যে কারণেই হউক, আজকালকার দিনে যাএ যাএ ঘরকরনার সম্ভাবনা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। তবে এখনও পল্লীগ্রামে যাএ যাএ একত্রবাসের দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়। রামায়ণে সীতা ও লক্ষ্মণের আদর্শ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অমূল্য অবিনশ্বর সম্পত্তি। 'লক্ষ্মণের মত দেবর পাব' নারীজীবনের এই সাধ আজও ব্রতমন্ত্রে দেখিতে পাই ; কিন্তু আজ্ঞাকারী ঠাকুরপো ও স্নেহময়ী বৌদিদি আর বাস্তবজীবনে অধিক মিলে কি ?

যাহা হউক, 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হওয়াতে হয়ত হালের গৃহিণীগণকে বড় একটা যা লইয়া ঘর করিতে হয় না, কিন্তু শ্বাশুড়ীকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া সংসার-ভগ্নাংশের সম্পূর্ণ সরলতা-সম্পাদন আজও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটিয়া উঠে নাই। অতএব শ্বাশুড়ী-বৌ সম্পর্কের কথার একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন। বাস্তবিক, এই শ্বাশুড়ী-বৌ সম্পর্কই আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মেরুদণ্ড। বিলাতী নজির না তুলিলে, আমাদের সকল সামাজিক প্রথা, সকল আচার অনুষ্ঠানই হেয় অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বিবেচনা করেন, এমন এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক আছেন ; তাঁহাদিগের অবগতির জন্য প্রথমেই ভারততত্ত্বাভিজ্ঞ ডাক্তার পোলেনের (Dr. Pollen) বিলাতী বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

The ·Mother-in-law system of training in Indian families had, in most cases, been fruitful of good results, and had produced Indian mothers and wives, not learned in the Western sense of the word, but skilled in gracious household ways and endowed with a wealth of moral legendary lore or love of art and song.

(অনুবাদ অনাবশ্যক, কেন না ইংরেজীনবীশদিগের জন্যই এই নজির উদ্ধৃত করা।)

ফল কথা, শাশুড়ীই গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্য বধূকে হাতে ধরিয়া শিখাইয়া লয়েন। আবার শাশুড়ী অল্পবয়স্কা পুত্রবধূকে যে শিক্ষা দেন, পুত্রবধূ ঘরণী গৃহিণী হইয়া সেই শিক্ষা তাঁহার পুত্রবধূ ও অল্পবয়স্কা যাকে দেন। এইরূপ পরম্পরাক্রমে সাংসারিক ও সামাজিক ধর্ম্মকর্ম্ম-শিক্ষা নারীহৃদয়ে সংক্রামিত হয়। ইহাই আমাদের সমাজের প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা। যাহাতে এই শিক্ষা-দীক্ষা সুচারুরূপে প্রদত্ত হইতে পারে, তজ্জন্যই আমাদের সমাজে কন্যাগণের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়ার রীতি প্রচলিত। যেমন কলম বাঁধিতে হইলে বড় গাছের সঙ্গে চারা গাছের সংযোগ ঘটাইতে হয়, সেইরূপ একজন পরকন্যাকে একটি বৃহৎ পরিবারের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হইলে অল্পবয়স্কা কন্যার প্রয়োজন। যাহা হউক, তথাকথিত বাল্যবিবাহের পক্ষে ওকালতী করা আমার উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমেই কেবল এ কথা তুলিলাম। এক্ষণে শাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক-সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

ছেলেটি বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবে, লক্ষ্মীস্বরূপা বধূ ঘরে আসিবে, এ সাধ-আহ্লাদ বাঙ্গালীর ঘরে সকল জননীই করেন। অনেকের আবার এ সাধ এতদূর প্রবল হয় যে, শৈশবেই পুত্রটির উদ্বাহবন্ধন ঘটাইয়া দেন, দুধের

ছেলের একটি খেলার সাথী যুটাইয়া দেন—সংসারের ছায়াবাজীতে জীয়ন্ত পুতুল-খেলা দেখিয়া চক্ষুঃ সার্থক করেন। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে উপনয়নের পর বৎসর না ঘুরিতেই বিবাহক্রিয়া সমাধা হইতে আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি। (১) কিন্তু এত সাধ করিয়া অনেক সময় শেষরক্ষা হয় না। বাঙ্গালীর সংসারে বৌকাঁট্‌কী শ্বাশুড়ীর অপ্রতুল নাই। অনেক ক্ষেত্রে বধূও নিতান্ত ভালমানুষটি নহেন। কিন্তু উগ্রচণ্ডা বধূ অপেক্ষা রণচণ্ডী শ্বাশুড়ীই বোধ হয় বেশী—কেন না ভাষায় 'বৌকাঁট্‌কী' শব্দ রহিয়াছে কিন্তু 'শ্বাশুড়ীকাঁট্‌কী' শব্দ নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তখনকার দিনে এত স্বেচ্ছাচারিতা ছিল না, শাসনও খুব কঠিন ছিল। সুতরাং বধূরা প্রবলা হইতে পারিতেন না। আজকালও সংবাদপত্রে বধূর উপর শ্বাশুড়ী-ননদের অত্যাচার-কাহিনী মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তিত হয়। ঘটনাগুলি সকল স্থলে নিতান্ত নীচ জাতির গৃহেও সংঘটিত হয় না। তবে দুর্মুখী লোকে হয়ত বলিবে,—যে সকল ক্ষেত্রে শ্বাশুড়ী-ননদ বধূর হাতে নির্য্যাতিত হয়েন, সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা লোকলজ্জাভয়ে কীল খাইয়া কীল চুরি করেন, ব্যাপারটা চাপিয়া যান, শ্রাদ্ধ আদালত পর্য্যন্ত গড়ায় না, তাই সে সব কথা সাধারণে জানিতে পারে না। নতুবা, স্বীকার করিতে হইবে যে, কবিকঙ্কণ কলির দোষকীর্ত্তনে 'বধূজন হ'বে বলী, শ্বাশুড়ীর ধরি চুলি, শ্বশুরে করিবে অপমান' বলিয়া যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন তাহা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

(১) বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের মধ্যে, রাজা রামমোহন রায়ের আট বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ হয়, এবং সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের একাদশ বর্ষ বয়সে পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার সহিত প্রথম বিবাহ হয়। ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষ বয়সে প্রথম বিবাহ হয়। ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের একাদশ বর্ষ বয়সে বিবাহ হয়। ৺অক্ষয়কুমার দত্তের ১৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া বোধ হয় তাঁহার অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল!

ব্রতকথা রূপকথা প্রভৃতির ভিতর সন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সেকালেও জটিলা-কুটিলাগণ সংসার-আসর যুড়িয়া থাকিতেন। রূপকথায় বধূর প্রতি শাশুড়ীর নিষ্ঠুরতার উদাহরণ মিলে। এ সব কথা 'শাশুড়ী-বৌ' প্রবন্ধে সবিস্তারে বলিয়াছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বারে বারে মেয়েমহলে প্রচলিত ব্রতকথা প্রভৃতির উল্লেখ করিলে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হয় ত বলিয়া বসিবেন, ইহা লেখকের পদোচিত ও বয়ঃসমুচিত গাম্ভীর্য্যের পরিচায়ক নহে। কিন্তু ধরিতে গেলে, এই সব মেয়েলি ছড়া ও কথায়ই জাতীয় জীবন ও চরিত্র নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত। আমাদের ঘরের সোণার চাঁদ কবি বাঙ্গালীর মেয়ের 'ব্রতকথা, উপকথা, সেঁজুতি পালন' অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সেগুলির ভিতর যে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য, যে সমাজতত্ত্ব, চরিত্রতত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার পর আর কেহ বোধ হয় সাহস করিয়া সেগুলিকে টিটকারী দিতে পারিবেন না! (২)

শাশুড়ী-বৌএর এই অসদ্ভাব-অসম্প্রীতির কারণ কি? কথাটা শুনিতে হয় ত কেমন কেমন ঠেকিবে, কিন্তু ইহা মনস্তত্ত্বের একটি সুন্দর রহস্য যে ভালবাসা পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করিলেও মূলে এক। সন্তানবাৎসল্য, ভ্রাতৃস্নেহ, পতিপ্রীতি, পত্নীপ্রেম, সহোদরা-প্রীতি, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, সকলই এক রসের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। মাতার সুপবিত্র স্নেহ এবং পত্নীর পবিত্র প্রণয়—এই দুই প্রকারের ভালবাসাই স্বর্গীয় বস্তু হইলেও উভয়ের মধ্যে রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি, আড়াআড়ি কাড়াকাড়ি একটু থাকিবেই। সুতরাং বধূ যৌবনস্থা হইলে জননীর মনে এরূপ আশঙ্কা হওয়া অস্বাভাবিক নহে,—বুঝি পরের মেয়ে ঘরে আসিয়া

(২) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ (সাধনা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩০১।)

আমার পেটের ছেলেকে, আমার নাড়ীছেঁড়া ধনকে, পর করিয়া দিবে। এই আশঙ্কায়ই অনেক স্থলে শ্বাশুড়ী বধূকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিতে থাকেন, ছেলে যাহাতে বৌকে বিষ দেখে তাহার অবিরত চেষ্টা করেন। ইহাতে বধূর হৃদয়ও অবশ্য কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইয়া উঠে না। ক্রমেই একটা ছাড়াছাড়ি ভাব, একটা অবনিবনাও, আসিয়া পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে আশঙ্কার কারণও বর্ত্তমান থাকে। বধূটি কিঞ্চিৎ খর-খর, হয় ত একটু রূপগর্ব্বিতা, এবং পুত্রটি দুর্ব্বলচিত্ত, রূপলালসায় অতি-মাত্রায় স্ত্রৈণ হইয়া পড়ে (বিশেষতঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের হইলে), পত্নীপ্রীতি ও মাতৃভক্তি উভয় বৃত্তির সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না, ফলে গর্ভধারিণী জননীর নানারূপ লাঞ্ছনা-অবমাননা ঘটে। বিধবা মাতার বেলায় এই কথাগুলি বিশেষ ভাবে খাটে।

মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অনেকে হয় ত মধুর রসের পরিবর্ত্তে বীভৎস রসের সঞ্চার আশঙ্কা করিতেছেন। তাই সূক্ষ্ম তত্ত্ব ছাড়িয়া কয়েকটি মোটা কথা বলিব।

সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইব, এই অভিলাষ সকল নারীই করেন, ইহা নারীর একটা বড় অধিকার। সুতরাং, এই অধিকারে কেহ 'ভাগীদার' যুটিবে, এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহা কোন নারীই বরদাস্ত করিতে পারেন না। অনেক সময়ে, ইহা হইতেই শ্বাশুড়ীবৌএ কলহের উৎপত্তি হয়। আজকালকার দিনে বধূরা আর প্রৌঢ়বয়স পর্য্যন্ত শ্বাশুড়ীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে চাহেন না, বড়গাছের আবডালে থাকায় যে কি সুবিধা তাহা বুঝিতে চাহেন না, একটু সেয়ানা হইয়াই আপন গণ্ডা বুঝিয়া লইতে চাহেন। গুণধর স্বামীও অনেক সময় স্ত্রীর দিক্ লয়েন। পক্ষান্তরে, শ্বাশুড়ীও বধূর হাততোলা খাইতে চাহেন না, কোণঠেসা হইতে রাজী নহেন, বাঁচিয়া থাকিতেই মরার সামিল হইতে প্রস্তুত নহেন, হাসি-

মুখে কর্ত্তৃত্ব-ক্ষমতা বধূর হস্তে ন্যস্ত করিতে সম্মত নহেন, ফলে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হয়। এই অশান্তি-নিবারণকল্পে সাধারণতঃ দুইটি উপায় অবলম্বিত হয়। স্বামী 'সস্ত্রীক শকটারোহণে' কর্ম্মস্থলে চলিয়া যান, মা হয় দেশে কুঁড়ে আগলাইয়া থাকেন ও ভিটায় সন্ধ্যা দেন, আর না হয় হিন্দুর পিঁজরাপোল কাশী বা শ্রীবৃন্দাবনে চালান হন! আপৎশান্তি! (৩) কোন কোন স্থলে আবার উভয়পক্ষে আপোষ হয়। জননী বিনাবেতনে পাচিকাবৃত্তি ও দাসীবৃত্তি করিয়া পুত্রের সংসারে উদরান্নের সংস্থান করেন। অবশ্য এ সমস্ত কথাও বিধবা মাতার বেলায় খাটে।

গৃহস্থালীর এই বিষম সমস্যা লক্ষ্য করিয়াই আমাদের মেয়েলি শাস্ত্রে নিম্নলিখিত সুন্দর প্রথা চলিত আছে—বর বিবাহকালে বলিয়া যান, 'মা, তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি।' কিন্তু অনেক স্থলে ইহা স্তোকবাক্যে পর্য্যবসিত হয়। মেয়েমহলে একটি কৌতুককর উদ্ভট পুরাণ-প্রবাদ প্রচলিত আছে, এই প্রসঙ্গে সেটির উল্লেখ স্থানোচিত। কথিত আছে, কুমার কার্ত্তিকেয় এক সময়ে আইবুড় নাম ঘুচাইবার জন্য ঘটা করিয়া বিবাহযাত্রা করেন, পরে কি একটা প্রয়োজনে গৃহে এক মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ঘরের মধ্যে মা দুর্গা দশহাত বাহির করিয়া খাইতেছেন। কার্ত্তিকেয় সর্ব্বদা জননীর দুই হাতই দেখিতেন, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, এ কি?' মা দুর্গা বলিলেন,—'বাবা, বৌমা ঘরে এলে আর ত খেতে দেবেন না, তিনিই একেশ্বরী হইয়া উঠিবেন, তাই এই বেলা আশ মিটিয়ে খেয়ে নিচ্ছি।' ষড়ানন শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার চক্ষুঃ ফুটিল, বিবাহের সাধ তাঁহার মাথায় উঠিল। সেই অবধি তিনি অকৃতদার!!

(৩) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কৌতুকচ্ছলে বলেন যে, এই জন্যই বোধ হয় পূর্ব্বকালে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদিগের বানপ্রস্থের ব্যবস্থা ছিল!

আর এক কথা। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার সাধারণ নিয়ম। শিশুজীবনে দেখা যায়, অধিকবয়স্ক বালক অল্পবয়স্ক ভাই-ভগিনী-গুলিকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করে। শ্বাশুড়ীর অত্যাচারও অনেক সময়ে এই সাধারণ নিয়মের ফল। আবার আমরা ছেলেবেলায় অনেকে যেমন মা-বাপ বা গুরুমহাশয়ের হাতে যে মার খাইয়াছি, সেই মার মায় সুদ নিজ সন্তান বা ছাত্রের উপর চালাইয়া পরম প্রীতিলাভ করি, অনেক শ্বাশুড়ীও সেইরূপ পুত্রবধূর উপর দিয়া নিজের বধূকালের নির্য্যাতনের দাদ তোলেন। আজকাল আবার কলিকাতা অঞ্চলে বরপণের বা তত্ত্বের ব্যাপারে বরের মাএর চিত্তে যে অপ্রসন্নতা হয়, তিনি সে ঝালটা বধূর উপর ঝাড়িয়া তাহার সহিত ভবিষ্যৎ মনান্তরের সূত্রপাত করেন। আবার যদি বধূ বিবাহের অল্পদিন পরেই বিধবা হয়, তবে সেই অলক্ষণার দোষেই এই অত্যাহিত ঘটিয়াছে, শ্বাশুড়ীর মনে ধ্রুব ধারণা হয় এবং অভাগিনীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা থাকে না।

ইহার উপর, মনস্বী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার সুচিন্তিত 'পারিবারিক প্রবন্ধে' এতৎপ্রসঙ্গে শ্বাশুড়ীর আর একটি আক্রোশের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন---তাহা মেয়েলি ছড়ায় নিম্নোদ্ধৃতভাবে গ্রথিত আছে।—

এমন সুন্দর মেয়েটি আমার যাবেন পরের ঘর
আর গোব্দামুখীর মেয়ে এসে খাবে দুধের সর॥

ইহার জন্যও শ্বাশুড়ীর বধূকে বিষনয়নে দেখিবার সম্ভাবনা। ঘরজামাই না রাখিলে মাএর মনের এ খেদ মিটিবার উপায় নাই। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত কয়েকটি কারণ সধবা বিধবা উভয় শ্রেণীর মাতার বেলায়ই তুল্যরূপে খাটে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম তাহা হইতে অনেকে ভাবিতে পারেন, তবে বুঝি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে নিত্য গজকচ্ছপের যুদ্ধ অভিনীত হইতেছে, শ্বাশুড়ী-বৌএর রেষবিষে সোণার সংসার জ্বলিয়া যাইতেছে। প্রকৃত কথা অবশ্য তাহা নহে। কেন না সেরূপ হইলে এত দিনে সংসার শ্মশান হইত। শ্বাশুড়ী বৌ-অন্ত প্রাণ, বৌও শ্বাশুড়ীর বাধ্য, এরূপ দৃশ্য নিতান্ত বিরল নহে। তবে ইতিহাসে যেমন দেখা যায়, সপ্তবর্ষব্যাপী বা শতবর্ষ-ব্যাপী সমরের, অল্পকালস্থায়ী বা অধিককালস্থায়ী যুদ্ধব্যাপারের বৃত্তান্তই সবিস্তারে বর্ণিত হয়, ত্রিংশদ্‌বর্ষব্যাপী শান্তি-সুখের বৃত্তান্ত বড় একটা বর্ণিত হয় না, সেইরূপ সমাজেও বিরোধের ব্যাপারটাই সহজে চোখে পড়ে, সদ্ভাবের জীবন ততটা নজরে আসে না।

ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বিরোধের ব্যাপারে উভয় পক্ষের দোষ না থাকিলে কলহ হয় না, এক হাতে তালি বাজে না। এক সঙ্গে ঘর করিতে হইলে সময়ে সময়ে সামান্য একটু খিটিমিটি হয়, শুধু শ্বাশুড়ী-বৌএ কেন, স্বামিস্ত্রীতেও হইয়া পড়ে। তাহা ধর্ত্তব্য নহে। তবে আজ-কালকার দিনে এমন অনেক অসহিষ্ণু বধূ দেখা দিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের একটি সামান্য কথার আঁচ সহে না, একটু নড়িয়া বসিতে বলিলে কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করেন, অথবা অভিমানে আত্মহত্যা করেন। এ সকলই কালের ধর্ম্ম।

যাক্ শ্বাশুড়ী-বৌএর কথা সবিস্তারে বলিলাম। যাএর কথা সংক্ষেপে সারিয়াছি। এক্ষণে ননদ-ভাজের কথা একটু তুলিব।

অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, বাঙ্গালীর ঘরে বিবাহিতা নারীকে শ্বাশুড়ী (ও যা) লইয়া যেমন বারমাস ঘর করিতে হয়, ননদ বা ভাজকে লইয়া সেরূপ ঘর করিতে হয় না। (এ কথা 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে আলোচনা

করিয়াছি।) কিন্তু তথাপি সেকালে ও (কোথাও কোথাও) একালেও কুলীনের ঘরে এবং ধনিগৃহে বয়ঃস্থা সধবা বা বিধবা কন্যা বারমাস পিতৃগৃহে বাস করেন, ইহা একেবারে অজ্ঞাত নহে। আর সন্তানপ্রসব, পীড়ার চিকিৎসা, মাতাপিতার সাংসারিক প্রয়োজন বা পারিবারিক উৎসব উপলক্ষে বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করেন, ইহা অবশ্য প্রচলিত প্রথা। সুতরাং ননদ-ভাজের পরস্পর স্নেহবন্ধন না থাকিলে এ সকল ক্ষেত্রে অশান্তির সূত্রপাত হইতে পারে। পক্ষান্তরে বিধবা, বিশেষতঃ বালবিধবা সন্তানহীনা ননদ, ভাজের সংসারে থাকেন এবং তিনিই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হয়েন, এ নিয়মও অনেক স্থলে দেখা যায়। এ সকল স্থলে সুধু গৃহস্থালীর কায কেন, সন্তান-পালনের ভারও বিধবা ননদ লইয়া থাকেন। ছেলে-মেয়েরা মাএর চেয়ে পিসিমাকেই বেশী চেনে ও তাঁহারই নেওটা হইয়া পড়ে এবং পিসিমাও চিরসঞ্চিত মাতৃস্নেহ তাহাদিগের শিরে বর্ষণ করেন, এ দৃশ্য বহু পরিবারে দেখা গিয়াছে। তবে আজকাল ননদের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে ভাজেরা বড় রাজী নহেন।

ননদের প্রতি শ্বশুরশাশুড়ীর অর্থাৎ তাঁহার মাতাপিতার স্নেহাধিক্য দেখিলে বধূর তাহা অসহ্য হয়। বধূ ইহাকে পক্ষপাত মনে করিয়া বসেন। বাস্তবিক কিন্তু এই পক্ষপাত বধূর কল্পনা-প্রসূত বা দ্বেষ-সমুদ্ভূত বই আর কিছুই নহে। কন্যা পিত্রালয়ে আসিয়া একটু আরাম পায়, গৃহস্থালীর পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য-সম্পাদন হইতে অব্যাহতি পায়, মাতাপিতার আন্তরিক ইচ্ছা ; পীড়িতা বা আসন্নপ্রসবা কন্যার বেলায় ইহা ত অতি প্রয়োজনীয়। অথচ এইটুকুতেই বধূ শ্বশুরশাশুড়ীকে 'একচোকো' ভাবিয়া বসেন। ইহার উপর আবার যদি স্নেহময় অগ্রজ বাল্যসঙ্গিনী স্নেহপাত্রী ভগিনীকে বহুদিন পরে পাইয়া তাহার আদর-যত্ন একটু বেশী বেশী

করেন, তাহা হইলে বধূর তাহা আরও অসহ্য হইয়া পড়ে। নিজের প্রাপ্য আদর অপরে পাইল বলিয়া তিনি অভিমান করিয়া বসেন। ইহাতে একটু দ্বেষাদ্বেষি, রেষারেষি আসিয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, কোন কোন ননদও যে বধূর উপর একটু সর্দ্দারি করিতে তৎপর, শ্বশুরালয়ে পরের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিতে হয় বলিয়া পিত্রালয়ে আসিয়া কর্তৃত্ব ফলাইতে ব্যগ্র, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এ ক্ষেত্রেও বিরোধের কথার উপরই বেশী জোর দিলাম। ননদ-ভাজে গলায় গলায় ভাব, ননদ বৌদিদি বলিয়া অজ্ঞান, ভাজ ঠাকুরঝি বলিয়া অজ্ঞান, এরূপ দৃশ্যও বাঙ্গালীর সংসারে বোধ হয় নিতান্ত বিরল নহে।

ফল কথা, সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির আত্মপরায়ণতা, অপরিণামদর্শিতা, ঈর্ষ্যাদ্বেষ, ক্ষুদ্রাশয়তা, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা প্রভৃতির জন্য একান্নবর্ত্তী পরিবারে অশান্তি উপস্থিত হয়। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা অর্থে লেখাপড়া জানা বুঝেন, তাঁহারা বলেন, স্ত্রীশিক্ষার অভাবেই এই সব দোষ ঘটে। কিন্তু যাঁহাদিগের সেকালের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন যে লেখাপড়া না জানিয়াও সেকালের ঘরণী গৃহিণীরা যথেষ্ট উদার-হৃদয়া, স্নেহশীলা ও অপক্ষপাতিনী ছিলেন। বরং হালের যে সব মেয়েরা কিঞ্চিৎ কেতাবী বিদ্যা উদরস্থ করিয়াছেন, তাঁহারাই অতিমাত্র আত্মপরায়ণা ও আপাতসুখাভিলাষিণী হইয়া পড়েন, ইহাই দেখা যায়। ঈর্ষ্যাদ্বেষ ও ক্ষুদ্রাশয়তা ত ঘোর স্বার্থপরতারই প্রকারভেদ। অবশ্য সকল কালেই সু কু উভয় প্রকৃতির মানুষ আছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ও কালধর্ম্ম যে পুরুষ ও স্ত্রীলোককে অতিমাত্র বিলাসপ্রিয় ও আত্মসুখপরায়ণ করিয়া তুলিতেছে, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বাধীনতাপ্রিয়তা ত সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাধি। অনেক স্থলে ইহা অসংযমের নামান্তর। পূর্ব্বের মত এখন আর বয়ঃস্থা নারীরা শাশুড়ী, জ্যেঠশাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী, মামীশাশুড়ী,

মাসশাশুড়ী, পিসশাশুড়ী বা ননদের তাঁবে থাকিতে চাহেন না। বড় যাএর গিন্নীপনাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে বড় যাএরও ইহাতে বিলক্ষণ দোষ আছে। তিনি রোজগেরে স্বামীর পত্নী হইলে নিজের কোলপানে ঝোল টানেন, এ দৃশ্য বিরল নহে।

আবার পুরুষেরাও এ ক্ষেত্রে বেকসুর খালাস পাইতে পারেন না। অনেক স্থলে, পুরুষের দোষে স্ত্রীর চরিত্র ক্ষুদ্রাশয়তা প্রভৃতি দোষদুষ্ট হয়। পুরুষ কোন কোন স্থলে নারীকে অযথা প্রশ্রয় দেন, কোন কোন স্থলে তিনিই বিষয়সম্পত্তি লইয়া বিবাদ বাধাইয়া গৃহবিচ্ছেদে অগ্রণী হয়েন। স্ত্রীলোকের চরিত্র-গঠন পুরুষের একটি গুরুতর দায়িত্ব। আমরা কয় জন এই দায়িত্ব বুঝিয়া কায করি? এই কর্ত্তব্য-সম্পাদনের সুবিধার জন্য স্ত্রীজাতির অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত। কিন্তু আজকাল পুরুষেরা ইংরেজ সমাজের দেখাদেখি পিতাপুত্রে, পিতৃব্য-ভ্রাতুষ্পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে শিখিতেছেন এবং সেই বিষবীজ নারীগণের কোমল হৃদয়ক্ষেত্রেও সংক্রামিত করিতেছেন। আবার ইহাও সত্য যে, যদি নারীপ্রকৃতিতে ক্ষুদ্রাশয়তা দ্বেষপরায়ণতা কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি মজ্জাগত হয়, তবে পুরুষ হাজারও চেষ্টা করুন, কিছুতেই পরিবারে শান্তিস্থাপন করিতে পারিবেন না। সেই জন্যই পুনঃ পুনঃ নারীজাতির কথাই বেশী করিয়া বলিতেছি।

যাহা হউক, বিলাতী সামাজিক আদর্শের প্রভাবে, কালধর্ম্মে এবং জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার বৃদ্ধিবশতঃ অর্থকৃচ্ছ্রতার নিষ্পেষণে,—এই ত্রিবিধ কারণে একান্নবর্ত্তি-পরিবার-প্রথা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতিবিধানের উপায়-অবলম্বন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ কার্য্যের ভার বিজ্ঞ সামাজিকগণ গ্রহণ না করিলে ব্যাপার সুষ্ঠুরূপে নিষ্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যকেও এ কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে কয়েকটি ইঙ্গিত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সাহিত্যের কর্ত্তব্য।

প্রধানতঃ চারিটি উপায়ে বঙ্গীয় লেখকগণ এক্ষেত্রে সমাজের মঙ্গলসাধন করিতে পারেন।

(১) লোকশিক্ষা বা লোকমতগঠনের উদ্দেশ্যে চিন্তাশীল লেখকগণ এই সামাজিক সমস্যা-সম্বন্ধে সন্দর্ভ রচনা করিয়া কার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন। বর্ত্তমান লেখকের এই অকিঞ্চিৎকর আলোচনা ইহার একটি নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে, মনস্বী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' এই শ্রেণীর সাহিত্যের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'কুললক্ষ্মী' নামক একখানি নবপ্রকাশিত স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইতে পারে। যাহাতে এই শ্রেণীর গ্রন্থ অধিক পরিমাণে রচিত হয়, তদ্‌বিষয়ে সাহিত্যসেবী, সাহিত্যানুরাগী, গ্রন্থপ্রকাশক-সম্প্রদায় ও সাহিত্যসমিতিগুলির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

(২) এই প্রকারের আলোচনা কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হইলে তাহাতে সজীবতা আসে, পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় ও সহজেই মনোরঞ্জন হয়। এই বিবেচনায় ভূদেব বাবু 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র স্থানে স্থানে উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'গৃহলক্ষ্মী' আগাগোড়া এই প্রণালীতে লিখিত। 'ঠাকুর মা', 'লক্ষ্মী মা', 'লক্ষ্মী মেয়ে', 'লক্ষ্মী বৌ' প্রভৃতি পুস্তকেও এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। তবে সকল লেখকই যে এই বিচিত্র উপায়ে উপদেশাবলির সরসতা-সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন, এমন কথা বলি না। আরও অধিক-সংখ্যক লেখক এই পথ অবলম্বন করিলে প্রতিযোগিতার ফলে

ক্রমে রচনাকৌশল বা আর্টের উন্নতি হইবে এবং সেই উন্নতির অনুপাতে এই সাধু উদ্দেশ্য-সিদ্ধিরও সহায়তা হইবে।

(৩) 'সতী' 'সীতা' 'সাবিত্রী' 'দ্রৌপদী' 'অরুন্ধতী' 'বেহুলা' 'ফুল্লরা' প্রভৃতির আদর্শচরিত্র-অবলম্বনে যে সকল স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক রচিত হইতেছে সেগুলিও এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

(৪) এই ত্রিবিধ উপায় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ উপায় সাহিত্যচেষ্টার বহির্ভূত নহে। কল্পনাকুশল কবিগণ নূতন ধরণের কাব্যরচনা করিয়া এই উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ সফলতা দিতে সমর্থ।

'কাব্যং কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে'—অলঙ্কারশাস্ত্রের এই কথাটা বড় পাকা কথা। নাটক আখ্যায়িকা প্রভৃতি দ্বারা উচ্চ ও পবিত্র আদর্শগুলি যেমন গভীর ভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। জড়জগতে যেমন তাড়িতশক্তি মানবের নানাকার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে, সাহিত্য-জগতেও সেইরূপ কল্পনার চপলালোক সমাজের নানা মঙ্গলবিধানে, নানা আদর্শস্থাপনে, নানা প্রশ্নবিচারে, নানা সমস্যাসমাধানে, বিনিয়োজিত হইতেছে। অতএব নাটক ও আখ্যায়িকা রচনা করিয়া সমাজে সুন্দর আদর্শ প্রচার করা ক্ষমতাশালী লেখকদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ'—এই নীতি অবলম্বনে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া সেই দিকে প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবে এবং কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিয়া সেই দিক্ হইতে নিবৃত্তি জন্মাইতে হইবে।

আজকাল অন্তঃপুরে নাটক-নভেলের অবাধবাণিজ্য দেখা যায়। বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তা কুলবধূ ও কুলকন্যাদিগের অবসর-যাপনের প্রধান সহায় এই শ্রেণীর লঘু সাহিত্য। ব্রতকথা, কথকতা, পুরাণপাঠ প্রভৃতির আর তেমন রেওয়াজ নাই, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী

মহাভারতও অন্দর-মহলে আর তেমন আদর পায় না। (৪) এই কথা স্মরণ করিয়া যদি লঘুসাহিত্যের সরবরাহকারগণ আসমানি প্রেমলীলার বর্ণনা না করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর নাটক-নভেল আমাদের কুললক্ষ্মীদিগের হস্তে দেন, তাহা হইলেই মঙ্গল।

সুখের বিষয়, এ সম্বন্ধে অনেক নাটককারের ও আখ্যায়িকাকারের দায়িত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে। এই শ্রেণীর যে সকল নাটক ও আখ্যায়িকা-পাঠের সৌভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলির

---

(৪) শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্নমুকুলে' সন্ন্যাসী পিতার নিকট অরণ্যে প্রতিপালিতা হইয়াও নীরজা বলিতেছে,—"বাবা আমার জন্যে কত বই আনেন। আমার রামায়ণ আছে, মহাভারত আছে, সীতার বনবাস আছে, সাধক-সঙ্গীত আছে, আরো কত সঙ্গীত আছে,—আর দুর্গেশনন্দিনী বলে একখানি বই আছে—সেখানা কিন্তু আমার যেমন ভাল লাগে, এমন কোন বই না। বাবা আমাকে যখন গীতার মানে বলে দেন—আমার তখন তিলোত্তমার কথা মনে পড়ে। শাস্ত্র পড়তে আমার মোটেই ভাল লাগে না। উত্তররামচরিত, শকুন্তলা, রত্নাবলী আগে খুব ভালবাসতুম, এখন দুর্গেশনন্দিনী সব চেয়ে ভালবাসি।" আবার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীক বাবু' নামক প্রহসনে নায়িকা হেমাঙ্গিনী বলিতেছে,—"নভেল বোলে এক রকম নতুন বই উঠিয়াছে—তাতে যেমন জ্ঞানের কথা থাকে এমন আর কিছুতে না। আগে মহাভারত রামায়ণ পড়্‌তে কি ভালই লাগতো, কিন্তু নভেল পড়্‌তে শিখে অবধি সে গুল আর ছুঁতেও ইচ্ছে করে না।" এই দুইটি উক্তি ঠিক আধুনিক পাঠিকাদিগের রুচির নিদর্শন। পক্ষান্তরে, শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অনাথবন্ধু'তে সুশীলার অভিমত—"নাটক-নবেলের গল্প পাঁচ সাত দিন পরে গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু পৌরাণিক গল্পের উপদেশ সেরূপে ভোলা যায় না।"—আজকালকার খুব কম পাঠিকারই মনঃপূত হইবে। অতিরিক্ত নভেল-পাঠে নারীর স্বভাব কিরূপ কিম্ভুত-কিমাকার হইয়া যায়, তাহারই ব্যঙ্গচিত্র 'অলীক বাবু'তে ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'তিলতর্পণ' ও 'বৌমা'য় অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'ও (১ম ও ৩য় পরিচ্ছেদে কমলার চরিত্র-চিত্রণে) ইহার একটু আভাস আছে।

স্মৃতি আজও মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, স্থূলভাবে সেইগুলির পরিচয় দিলে আশা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

'ননদ-ভাজ' ও 'শ্বাশুড়ী-বৌ' প্রবন্ধদ্বয়ে দেখাইয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকখানি আখ্যায়িকায় এই দুইটি সম্পর্কের কেমন সুন্দর আদর্শ প্রচার করিয়াছেন।

মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা'য়, ৺দীনবন্ধু মিত্রের কয়েকখানি নাটকে, ৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটকে, ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত আখ্যায়িকা 'স্বর্ণলতা'য়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ'এ ও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্নমুকুলে' পারিবারিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকেও পারিবারিক জীবনের চিত্র আছে। এগুলির কথা প্রসঙ্গক্রমে 'শ্বাশুড়ী-বৌ' ও 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে সবিস্তারে বলিয়াছি। 'প্রফুল্ল'র প্রায় সমকালে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা'য় শ্বাশুড়ী, বধূ ও ননদের চিত্রত্রয় অতি সুন্দর, অতি পবিত্র।

'স্বর্ণলতা'র রচয়িতার 'অদৃষ্ট' নামক আর একখানি আখ্যায়িকায়ও দাদা বৌদিদির দাপটে কনিষ্ঠকে স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, এমন কি মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, নায়কের মাতা ও পত্নী মহামায়ার চিত্রে শ্বাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। অথচ মহামায়ার ভগিনী জয়দুর্গার, স্বামী ননদ ও শ্বশুরপরিবারের সহিত ব্যবহার অতি কদর্য্য। ডাক্তার বাবুর পরিবারে ননদভাজের অসম্প্রীতি বশতঃ ঘর ভাঙ্গিয়া গেল এবং গ্রন্থকার বিধবা নির্য্যাতিতা ননন্দার আশ্রয় যোটাইবার জন্য ব্রাহ্মমতে বিধবাবিবাহ দিয়া এই পারিবারিক সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন!

৺রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে 'মাধবীকঙ্কণে' ননদভাজের প্রীতিসম্পর্ক সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। 'বঙ্গবিজেতা'য় পুত্রবধূদ্বয় শ্বশুরকে যত্ন করিতেছেন, ইহাও সুন্দর দৃশ্য। তাঁহার শেষজীবনে লিখিত সামাজিক আখ্যায়িকা 'সংসারে' ও 'সমাজে' বহুস্থলে কথোপকথনচ্ছলে একান্নবর্ত্তি-পরিবারের দোষগুণ, শ্বাশুড়ী কর্ত্তৃক বধূর নির্য্যাতন প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। বিন্দু ও সুধার বড় জ্যেঠাইমা কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতা ও আত্মপরায়ণা হইলেও লোক মন্দ নহেন। পক্ষান্তরে, ছোট জ্যেঠাইমার ব্যবহার বড় কদর্য্য। সুধার বিধবাবিবাহের পর শ্বাশুড়ী ও ননদ লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকরনা করারও পরিচয় পাওয়া যায়। কালী-তারার প্রতি ননদ ও খুড়শ্বাশুড়ীদিগের দুর্ব্ব্যবহার কঠোর বাস্তব চিত্র।

৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র প্রারম্ভে শ্বাশুড়ী-বৌএর একটি আদর্শ-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'বৌমা' প্রহসনে আমাদের হালের হাল কঠোর বিদ্রূপের সুরে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তথাকথিত সভ্য বাঙ্গালীর চক্ষুঃ ফুটিবে কি ?

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা'য় স্নেহশালিনী শ্বাশুড়ী ও ভক্তিমতী বধূর চিত্র সুন্দর। তবে গ্রন্থকার হেতুবাদ দেখাইয়াছেন, উমা তাহার শ্বাশুড়ীর একমাত্র পুত্রের স্ত্রী, সুতরাং আদরিণী, এবং 'তাহার ননন্দা ছিল না, শ্বাশুড়ীর সকল আদর সে একাই ভোগদখল করিত।' কিন্তু পরে পুত্রকে পাপপথে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিধবা মাতা ঘৃণায়, লজ্জায়, রাগে, দুঃখে, কাশীবাস করিলেন; এ ক্ষেত্রে তিনি মাতার ও শ্বশ্রূর উচ্চতর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন নাই, গ্রন্থকার নিজেই এ কথা বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'তে শ্বাশুড়ীর চিত্র আর্ট হিসাবে উৎকৃষ্ট হইলেও আদর্শ হিসাবে সুন্দর নহে। বধূ আশালতার চরিত্র অতি সুন্দর, অতি মধুর।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'প্রেমের জয়ে' সৌভ্রাত্রের, দেবর-ভ্রাতৃবধূর ও যাএ যাএ সদ্ভাবের চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। বন্ধ্যা জ্যেঠাইমার দেবরপুত্রদিগের প্রতি মাতৃস্নেহও অতি সুন্দর। শৈলবালার বিধবা পিসিমার যেটুকু উল্লেখ আছে, তাহাতে বুঝা যায় তাঁহার ভাজের সহিত সম্পর্ক ভালই ছিল। পক্ষান্তরে, ঐ গ্রন্থে শৈল-বালার পিতৃগৃহের শ্বাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক কঠোর বাস্তব চিত্র। আখ্যায়িকার অপ্রধান পাত্র ডাক্তার রমেশচন্দ্রের মাতা আদর্শ স্নেহময়ী কর্ত্তব্যপরায়ণা শ্বশ্রূ; পক্ষান্তরে রমেশের স্ত্রী ঠিক হালের মুখরা উদ্ধতস্বভাবা বিলাস-পরায়ণা কর্ত্তব্যবোধশূন্যা 'বৌমা'!

ইহার বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর করের 'সুরবালা' এবং হালে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'নাগপাশ' ও 'অদৃষ্টচক্র' এই চারিখানি আখ্যায়িকায় ('নীলদর্পণ' নাটকের ন্যায়) পল্লীগ্রামের বৃহৎ একান্নবর্ত্তি-পরিবারের এবং সৌভ্রাত্র প্রভৃতি সদ্‌গুণের পূর্ণায়তন চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পরন্তু কলিকাতার হাওয়ায় এই বহুকালের ইমারতে কিরূপে লোনা লাগে তাহাও চিত্রের সম্পূর্ণতার জন্য প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখকত্রয় যেন হেমলেটের মত বলিতেছেন 'Look here, upon this picture, and on this'—'সেই চিত্র দেখ আর এই চিত্র দেখ'—কি অধঃপতন! শেষোক্তগুলির বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর করের 'অনাথ বালকে' একান্নবর্ত্তী পরিবারে সৌভ্রাত্রের, আদর্শ বৌদিদির, আদর্শ-সদ্‌গৃহিণী কাকীমার চিত্র অতি সুন্দর, অতি পবিত্র। 'সুরবালা'য় নায়িকা সুরবালা আদর্শপত্নী, কামিনী আদর্শবধূ; আর অপরা বধূ রূপবতী ঠিক কলির বৌ। আবার 'অনাথ বালকে' মোক্ষদার শ্বাশুড়ী রায়বাঘিনী; তাঁহার অত্যাচারে মোক্ষদার স্বাস্থ্যভঙ্গ ও পরে

অচিকিৎসায় অকালমৃত্যু হইল। শিবচন্দ্র বসুর পত্নী সঙ্কীর্ণহৃদয়া আত্মপরায়ণা গৃহিণীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সমাজস্থিতির অনুকূলে নিজ নিজ সাহিত্যশক্তি বিনিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া এই তিনজন গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদভাজন।

এই শ্রেণীর আখ্যায়িকার মধ্যে মনীষী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অনাথবন্ধু' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গৃহে সৎশিক্ষায় কন্যা ও বধূদিগের চরিত্র কিরূপে গঠিত হইতে পারে, পক্ষান্তরে গৃহে কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্ত ঘটিলে নারীপ্রকৃতি কিরূপে বিকৃত হয়, এই উভয়প্রকারের দৃষ্টান্তই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। আদর্শ একান্নবর্ত্তী পরিবারের চিত্র অঙ্কন করাই লেখকের উদ্দেশ্য। এই আদর্শ একান্নবর্ত্তী পরিবারের বালক-বালিকাগণ প্রথম হইতেই শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে কিরূপে এই পরিবারের উপযুক্ত ভাবেই গঠিতচরিত্র হইয়া উঠে, এমন কি, বৈবাহিক-পরিবারে পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব সংক্রামিত হইয়াছে, তাহা লেখক পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। পরন্তু আদর্শপরিবারে থাকিয়া আদর্শ শ্বশুর-শাশুড়ী ভাশুর যা প্রভৃতির দৃষ্টান্তে কিরণশশী পিতৃগৃহের কুশিক্ষা-সত্ত্বেও কিরূপে সংশোধিত-চরিত্রা হইলেন, তাহা বিস্ময়কর ও শিক্ষাপ্রদ। ইহা ছাড়া, পুস্তকে আরও বহু প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয়ের আলোচনা আছে। পুস্তকখানি স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সযত্নে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৺যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ক'নে বউ' আখ্যায়িকায়ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুন্দর আদর্শচিত্র আছে, সঙ্গে সঙ্গে আদর্শচিত্রের উজ্জ্বলতা-বৃদ্ধির জন্য কুৎসিত বাস্তবচিত্রেরও সমাবেশ আছে। পারিবারিক শিক্ষার গুণে বা দোষে কিরূপে নারীচরিত্র প্রভাবিত হয়, এই পুস্তকেও তাহা বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বড় যা যামিনী ও

ছোট যা সুশীলা (ক'নে বউ) উভয়ে স্ব স্ব পিতৃগৃহের দোষ বা গুণ পাইয়াছিলেন। সুতরাং পতিগৃহে আসিয়া একজন মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মী ও অপরজন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী হইলেন।

কতকগুলি ছোট-গল্পেও পারিবারিক জীবনের কোমল ও কঠোর দিক্ নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্থলে, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'লজ্জাবতী' গল্পের পুনরুল্লেখ করিতে পারি। ইহাতে শ্বাশুড়ী রায়বাঘিনী, কিন্তু ননদ স্নেহশালিনী। ৺ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'পূজার ফুল' ও 'দাদার কাণ্ড' এই দুইটি ছোট-গল্পেরও উল্লেখ করিতে পারি। 'পূজার ফুলে' সুষমা ও সরোজ এই দুই যাএর স্নেহপ্রীতির চিত্র বড় সুন্দর, তাঁহাদিগের সহিত শ্বশ্রূর সম্পর্কও সুন্দর। পক্ষান্তরে নৃত্যকালী' কলির বৌ ঘরভাঙ্গানী'র প্রকৃষ্ট নিদর্শন, তাঁহার শ্বাশুড়ী ও যাএর সহিত ব্যবহার অতি কদর্য্য। 'দাদার কাণ্ডে' প্রথম পক্ষের বৌদিদি আদর্শ বৌদিদি, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের বৌদিদি অতি মুখরা ও দ্বেষপরায়ণা। যাহা হউক, স্বামীর চরিত্রের দৃঢ়তায় তাঁহাকে শেষে পরাজয় মানিতে হইল। 'ভাঙ্গা ঘর আবার যোড়া লাগিল।' পুরুষ শক্ত হইলে যে স্ত্রীলোক ঘর ভাঙ্গিতে পারে না, ইহা হইতে এই শিক্ষাটি পরিস্ফুট হয়।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিরাজ বৌ' গল্পে মোহিনী আদর্শ যা। এ চিত্রের কাছে গল্পের নায়িকা বিরাজ বৌএর চিত্রও মলিন। উক্ত লেখকের 'বড়দিদি' নামক গল্পে ননদ-ভাজের অসদ্ভাবের কথা ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে এবং তৎপ্রসঙ্গে একটু সমীচীন আলোচনাও করা হইয়াছে।

ছোটগল্প-লেখকদিগের মধ্যে রবীন্দ্র বাবু ও প্রভাত বাবুর নাম সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তাঁহাদিগের রচিত গল্পের সংখ্যার অনুপাতে

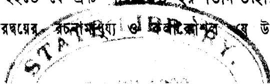
এইরূপ পারিবারিক চিত্র অতি অল্প। (৫) প্রভাত বাবুর 'নবকথা' বা 'দেশী ও বিলাতী' বা 'গল্পাঞ্জলি'তে পারিবারিক চিত্র দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। 'ষোড়শী'তে তিনটি গল্পে পারিবারিক জীবনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 'বউচুরি' গল্পে ননদ-ভাজ-সম্পর্ক অতি মধুরভাবে বিবৃত। 'কলির মেয়ে'তে বৌদিদির চিত্র সুন্দর, তবে শেষে তিনি যা-কে স্বামিসঙ্গ গ্রহণ করিতে দেখিয়া একটু টিপনি কাটিয়াছেন। 'প্রিয়তম' গল্পে শ্বাশুড়ীর বধূস্নেহ বড় করুণ, খুড়শ্বাশুড়ীটি কিন্তু 'পেটটি ভরা কুঁজড়ো কথা পরনিন্দা গ্লানি'র খনি।

এতদ্ভিন্ন, মাসিক পত্রে প্রকাশিত (ও পরে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত) বহু ছোট-গল্পে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের নিখুঁত ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অনেকগুলিতে লেখকগণ আদর্শচিত্রাঙ্কনে অথবা কুৎসিত বাস্তবচিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বিস্তারিত উল্লেখ অসম্ভব ও অসমীচীন, কেন না, আর অধিক উদাহরণ-সংগ্রহ করিলে গম্ভীর-প্রকৃতি সামাজিকগণের বিরক্তির উদ্রেক করিয়া তুলিব।

একান্নবর্ত্তি-পরিবার-প্রথাসম্বন্ধে স্থূল স্থূল কতকগুলি কথা বিশৃঙ্খল-ভাবে বলিলাম। আনুপূর্ব্বিক বিচার বা সুপরিস্ফুট সিদ্ধান্ত স্থাপন করা আমার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত। আধুনিক বাঙ্গালী-জীবনে ইহা একটা প্রধান 'ভাববার কথা'।

---

(৫) ইহা হইতে কেহ বুঝিয়া না বসেন যে, লেখক রবীন্দ্র বাবুর ও প্রভাত বাবুর ছোট-গল্পের নিন্দা করিতেছেন। লেখক যে দিক্ হইতে ছোট-গল্পের আখ্যানবস্তুর বিচার করিতেছেন, সে দিক্ হইতে যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তিনি তাহারই উল্লেখ করিতেছেন। উক্ত গ্রন্থকারদ্বয়ের রচনামাধুর্য্য ও কলাকৌশল যে উচ্চশ্রেণীর, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।



সমাপ্ত



